মানুষের প্রথম

অ্যাডভেঞ্চার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

হাঁহাঁর ছেলে ধাঁধাঁর কাণ্ড

ঐতিহাসিকের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র? পৃথিবীর জীবন-কাহিনি কত বৃহৎ! অগ্নিময় পৃথিবী কবে অপর গ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যপথে ছুটতে শুরু করলে, কোনও ঐতিহাসিকই তার সঠিক তারিখ জানেন না। আন্দাজে হিসাব দেন ৩,০০০,০০০,০০০ বৎসর! সেই পৃথিবীর আগুন ধীরে ধীরে নিবে গেল শত শত যুগান্তরের পরে। পৃথিবীর বুকে হল সাগর সৃষ্টি এবং সেই সাগরে হল কোটি কোটি জীবাণুর সৃষ্টি। জীবাণুর ক্রমেই বৃহত্তর আকার ধরতে লাগল, কেউ উঠল জল থেকে ডাঙায়, কেউ উড়ল ডাঙা থেকে শূন্যে! জীবেরা বাড়তে বাড়তে প্রায় চলন্ত পাহাড়ের মতো হয়ে উঠল—যেমন ডাইনোসর! কিন্তু কোনও ঐতিহাসিকই সেদিন জন্মগ্রহণ করেননি।

প্রকৃতি বারংবার পরীক্ষার পর বুঝলেন, মস্ত মস্ত জীব গড়া মিথ্যা পণ্ডশ্রম, তারা পৃথিবীর উপযোগী নয়। তিনি একে একে অতিকায়, নির্বোধ ও হিংসুক জীবগুলোকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে দিতে লাগলেন। এবং নতুন গড়নের এক জীব তৈরি করে নিযুক্ত হলেন পরীক্ষায়। এই নতুন জীবেরা ডাইনোসরদের দেহের তুলনায় নগণ্য, কিন্তু মস্তিষ্ক হল তাদের অসাধারণ। তারা নিজেরাই নিজেদের নাম রাখলে, 'মানুষ'।

কবে যে তাদের প্রথম সৃষ্টি, মানুষরাই তা ঠিক জানে না! কেবল কেউ কেউ আন্দাজি হিসাবে বলে, দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে বাস করছে। এ হিসাব মানলেও দেখি, আধুনিক মানুষের ইতিহাস অতি কষ্টে মাত্র ছয় হাজার বৎসর আগে গিয়ে পৌছুতে পেরেছে। বাকি দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার বৎসরের কোনও হিসাবই নেই! অন্যান্য পণ্ডিতের মতে, মানুষ জন্মেছে আরও অনেক—অনেক কাল আগে। যার যা খুশি বলছেন, কারণ ভুল ধরবার মতো নির্ভুল স্পষ্ট প্রমাণ কারুর হাতেই নেই!

কিন্তু পৃথিবী নিজে তার দেহের মাটি ও পাথরের স্তরে স্তরে লিখে রেখেছে মানুষের চমৎকার গল্প। মানুষ এতদিন পরে সেইসব গল্প আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমি তারই কতককতক তোমাদের শোনাব।

মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চিন ও পারস্য প্রভৃতি দেশের সভ্যতা সব চেয়ে পুরানো, একথা তোমরা জানো। কিন্তু আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন কোনও সভ্যতারই জন্ম হয়নি। সে যে কত হাজার বৎসর আগেকার কথা, তাও আমি বলতে পারব না।

ভারতবর্ষের তখন কোনও নাম ছিল না। মানুষও তখন কোনও দেশকে স্বদেশ বলে ভাবত না। তাদের সমাজও ছিল না। এক এক পরিবারভুক্ত মানুষরা কিছুদিন ধরে এক এক জায়গায় বাস করত। তখনও তারা চাষবাস করতে শেখেনি। বন থেকে ফলমূল কুড়িয়ে বা শিকার ধরে এনে তারা পেটের ক্ষুধাকে শান্ত করত। তারপর সেখানে ফলমূলের বা শিকারের অভাব হলেই অন্য কোনও দেশে গিয়ে হাজির হত। পৃথিবীতে তখন হিন্দু বা অন্য কোনও ধর্ম বা জাতি বা ভাষারও সৃষ্টি হয়নি। মানুষ কথা কইত বটে, কিন্তু তার কথার ভাণ্ডারে বেশি শব্দ ছিল না, তাই বেশি কথাও সে বলতে পারত না, ঠারে-ঠোরে ইশারাতেই অনেক কথার কাজ সারত। কেউ লিখতে জানত না। তখন শহর বা গ্রামের স্বপ্নও কেউ দেখেনি। যখন কেউ কোথাও স্থায়ী হয়ে বাস করে না তখন শহর বা গ্রাম বসাবার দরকারই বা কী? ওই কারণেই আজও বেদুইন প্রভৃতি জাতির দেশে শহর বা গ্রামের বিশেষ অভাব।

উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয়ের নিকটবর্তী এক দেশ।

এইখানেই উঁচু পাহাড়ের গুহায় একটি পরিবার বাস করে।

পরিবারের কর্তার নাম হাঁহাঁ। গিন্নির নাম হুয়া। তাদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলে তিনটির বয়স যথাক্রমে চব্বিশ, কুড়ি ও আট বৎসর। বড়ো মেয়ের

বয়স ষোলো ও ছোটো মেয়ের এক বৎসর। তাদের আরও ছেলে-মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা বেঁচে নেই।

গুহার ধারে একখানা বড়ো পাথরের উপরে বসে হাঁহাঁ সবিস্ময়ে দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়েছিল।

হাঁহা মানুষ বটে, কিন্তু তাকে দেখলে ভয়ে তোমাদের বুক কেঁপে উঠবে। তার মাথায় বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল—তেল ও জলের অভাবে কটা। কেবল মাথায় নয় সর্বাঙ্গেই রাশি রাশি বড়ো বড়ো চুল বা লোম। রং কালো কুচকুচে। কপাল ভয়ানক ছোটো, ভুরুর উপরকার অংশটা আবার সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দুই চোখে তীব্র বন্য ভাব। নাক থ্যাবড়া। শিকারি জানোয়ারের মতো বা ছবির রাক্ষসের মতো ধারালো ও ভীষণ দাঁত। চিবুক নেই বললেই চলে। বিষম চওড়া বুক। হাতে এবং বুকের পাশে ও তলায় লোহার মতন কঠিন পেশিগুলো ঠেলে ঠেলে উঠছে। আজানুলম্বিত বাহু দেহের তুলনায় ছোটো, মোটা মোটা পা-দুখানা বাঁকা, তাই তাকে হেলে-দুলে হাঁটতে হয় এবং হাঁটবার সময়ে সে পায়ের চেটো সমানভাবে মাটির উপরে ফেলতে পারে না। হাঁহাকে হঠাৎ দেখলে তোমরা গরিলা বলে মনে করবে, কিন্তু সে গরিলা নয়। কারণ লক্ষ করলেই দেখবে, সে কাপড় পরতে জানে—যদিও তার কাপড় হচ্ছে চামড়ার! আমরা যেমন করে গামছা পরি, হাঁহাঁও কাপড় পরে সেই ধরনে। হাঁহাঁ হাসতে জানে, কথা কইতে পারে। কাপড় পরা এবং হাসতে ও কথা কইতে পারা হচ্ছে মনুষ্যত্বের লক্ষণ। ইউরোপের পণ্ডিতরা তখনকার মানুষদের নাম দিয়েছেন নিয়ানডেটাল মানুষ।

হাঁহাঁ সবিস্ময়ে যে দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে ভীষণ দাবানল—আকাশের একটা দিক জুড়ে! লক্ষ লক্ষ শিখা-বাহু বাড়িয়ে দাবানল যেন আকাশকেও গ্রাস করতে চায়।

ওই দাবানল জ্বলছে যে-বনে, ওইখানেই হাঁহাঁ বউ আর তার সন্তানদের নিয়ে একটি গুহায় বাস করত। কিন্তু দাবানলের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সে এই নতুন বাসায় পালিয়ে এসেছে।

হাঁহাঁ মাঝে মাঝে এইরকম দাবানল দেখে বটে, কিন্তু তার রহস্য বুঝতে পারে না। সে তাকে জীবন্ত ক্ষুধার্ত ও ভয়াবহ কোনও দেবতা বলে মনে করে। তার ভয়ও হয়, ভক্তিও হয়। দাবানলের অপূর্ব শক্তিও সে দেখেছে। যে-রাতের অন্ধকার তার জীবনের অভিশাপের মতো, যে তার চোখ অন্ধ করে, বুকে বিভীষিকা জাগায়, একমাত্র দাবানলকে দেখলেই সে দূরে পালিয়ে যায়। অন্ধকারকে তাড়াবার কোনও উপায়ই জানা নেই, কারণ সে আগুন সৃষ্টি করতে পারে না। তারপর ম্যামথ-হাতি, রোমশ গণ্ডার ও গুহা-ভালুক প্রভৃতি হিংস্র ভয়ঙ্কর জন্তুরা ওই দাবানলের কোপে পড়লে কত সহজে ছটফটিয়ে মারা যায়, সেটাও সে স্বচক্ষে দেখেছে।

হাঁহাঁ তাই দাবানলকে দেখতে দেখতে ভাবছিল, ওর খানিকটা যদি আমার হাতে পাই, তাহলে রাতের অন্ধকারকে আর সমস্ত জীবজন্তুকে আমি জব্দ করতে পারি।

হাঁহাঁ নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে, পাহাড়ের তলা দিয়ে দলে দলে ম্যামথ-হাতি, রোমশ গণ্ডার, বন্য বৃষ, বুনো কুকুর, নেকড়ে বাঘ ও হরিণ দাবানলের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে! সে চেঁচিয়ে বউকে ডাকলে, হুয়া! হুয়া!

হুয়া গুহার ভিতরে বসে রাতের খাবার তৈরি করছিল। কতকগুলো বুনো গাছের থেঁতো করা শিকড়, গোটাকয়েক ফল আর পাঁচটা ইঁদুর। নতুন জায়গায় এসে হাঁহাঁ এখনও শিকারের সন্ধান পায়নি, তাই আজ আর এর চেয়ে ভালো খাবার হয়তো জুটবে না। ইঁদুরগুলোকে হুয়া নিজেই গুহার ভিতরে ধরেছে।

স্বামীর ডাক শুনে সে গুহার ভিতর থেকে ছোটো মেয়েকে কোলে করে বেরিয়ে এল। তারও চেহারা অনেকটা হাঁহাঁর মতোই দেখতে বটে, কিন্তু আকারে আরও ছোটো এবং তার মুখের ভাবও ততটা কঠোর নয়।

হাঁহাঁ শুধোলে, টুটু আর ঘটু কোথায়?

টুটু আর ঘটু হচ্ছে হাঁহাঁর বড়ো ও মেজো ছেলের নাম।

হুয়া কোনও উত্তর না দিয়ে বনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে। হাঁহাঁ বুঝলে, তারা বনে শিকার খুঁজতে গিয়েছে। তার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল, কারণ বনে আজ দাবানলের ভয়ে অগুনতি জন্তুর আমদানি হয়েছে, শিকারের পক্ষে সে-স্থান নিরাপদ নয়।

হুয়া হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। হাঁহাঁ চমকে ফিরে দেখলে, হুয়া সভয়ে পাহাড়ের উপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেইদিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল, একটা প্রকাণ্ড গুহাভাল্লুক পাহড়ের অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই কটমট করে চেয়ে আছে।

হাঁহাঁ তাড়াতাড়ি পায়ের তলা থেকে বর্শটা তুলে নিলে। একটা বাঁশের ডগায় চকমকিপাথরের ফলা বসিয়ে বর্শাটা তৈরি করা হয়েছে। তখনও পৃথিবীতে কেউ লোহা আবিষ্কার করতে পারেনি, কাজেই চকমকি-পাথর কেটেই অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা হত।

ওই গুহাভালুকই ছিল তখনকার মানুষদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। তখনকার মানুষের মতো সেকালের গুহাভাল্লুকরাও এখনকার ভালুকের চেয়ে আকারে ঢের বেশি বড়ো হত এবং মানুষের মাংস তারা ভালোবাসত। হাঁহাঁর দুটি সন্তান ও একটি বউ তাদেরই পেটে গিয়েছে।

হাঁহাঁ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, ধাঁধাঁ কোথায়?” ধাঁধাঁ তার ছোটো খোকার নাম।

হুয়া বললে, ঝরনায়।

হাঁহাঁ ইশারায় হুয়াকে গুহার ভিতরে যেতে বলে নিজে চলল ধাঁধাঁর খোঁজে। ঝরনা বেশি দূরে নয়, ঝরনার কাছে বলেই হাঁহাঁ এই গুহাটিকে পছন্দ করেছিল।

হাঁহাঁ কিছুদূর অগ্রসর হয়েই শুনতে পেলে, তার ছোটোছেলে খিল-খিল করে সকৌতুকে হাসছে!

হাঁহাঁ অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল, ধাঁধাঁর এত হাসির ঘটা কেন? কিন্তু পাহাড়ে-পথের মোড় ফিরতেই হাঁহাঁ যা দেখলে, তা কেবল আশ্চর্য নয়—কল্পনাতীত! তার পা আর চলল না, সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল!

ঝর-ঝর করে ঝরে পড়ছে ঝরনার রুপোলি ধারা। তার পাশেই পাহাড়ের উপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ধাঁধাঁ এবং তারও ওষ্ঠাধর দিয়ে ঝরে পড়ছে খুশিভরা কলহাস্যের ধারা!

কিন্তু তার সামনেই ওটা কী, ওটা কী? হাঁহাঁ খুশি হবে, কী ভয় পাবে, বুঝতে পারলে না এবং নিজের চোখকেও সে বিশ্বাস করতে পারলে না,—হঠাৎ প্রচণ্ড স্বরে চেঁচিয়ে উঠে প্রকাণ্ড এক লম্ফ ত্যাগ করলে!

খোকা-আগুনের আগমন

হাঁহাঁ যা দেখলে তা হচ্ছে এই

পাহাড়ের এক অংশ সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে। এবং সেই সব ধাপ দিয়ে লাফাতে লাফাতে ও ঝর্ঝর-গীত গাইতে গাইতে নেমে আসছে ছোট্ট একটি ঝরনা,— শিশুর মতন সকৌতুকে অস্তোন্মুখ সূর্যের রঙিন আলো তার নাচের ভঙ্গির সঙ্গে ঝলমল করে উঠছে।

ডান পাশে পাহাড়ের কতক-সমতল একটা জায়গায় বসে আছে ধাঁধাঁ, তার সামনেই একরাশ শুকনো ঘাস ও লতাপাতা—ঝোড়ো বাতাসে উড়ে এসে সেখানে জড়ো হয়েছে।

সর্বপ্রথমে হাঁহাঁ দেখলে, সেই শুকনো ঘাস লতাপাতাগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য একটা আগুনের ঢেউ! হাঁহাঁর মনে হল, দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ সে আকাশের কোল-জোড়া যে বিরাট দাবানল দেখছিল, এই ছোট্ট আগুনটা যেন তারই নিজের খোকা! ছুটোছুটি-খেলা খেলতে খেলতে সে যেন বাপের কাছ থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে! কিন্তু সে দাবানলকেই দেখেছে—বিরাট রূপ ধরে যে আকাশকে গিলে ফেলতে চায়, বাতাসকে তাতিয়ে তোলে, ফলমূলের লোভে বড়ো বড়ো অরণ্যকেই গ্রাস করে ফেলে, বনের জীবজন্তুদের পিছনে পিছনে বিষম ধমক দিতে দিতে তাড়া করে আসে। একটু-খানিক জায়গায় এমন খোকা-আগুনকে হাঁহাঁ কোনও দিন নাচতে দেখেনি!

একটু আগেই সে দাবানলকে দেখে ভেবেছিল, ‘ওর খানিকটা যদি আমার হাতে পাই, তাহলে রাতের অন্ধকারকে আর সমস্ত জীবজন্তুকে আমি জব্দ করে দিতে পারি।

এখন ভাবলে, এই তো আগুন-খোকাকে হাতে পেয়েছি! এখন আমি যদি একে ধরে ফেলি

কিন্তু পরমুহূর্তেই আর এক স্বপ্নাতীত দৃশ্য দেখে সে ভয়ানক চমকে উঠল।

তাঁর ছেলে ধাঁধাঁ ওখানে দুই হাঁটু গেড়ে বসে ও কী করছে?

ধাঁধাঁর দুই হাতে দুটো ছোটো ছোটো গাছের ডাল। সে মহা আনন্দে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ডালের উপরে ডাল রেখে ঘষছে, আর যে লতা-পাতা-ঘাসগুলো তখনও জ্বলেনি, সেগুলোও দপ-দপ করে জ্বলে উঠছে!

হাঁহাঁর চোখ কি ভুল দেখছে? না, তা তো নয়? সত্যসত্যই ধাঁধাঁ নতুন নতুন খোকা-আগুন সৃষ্টি করছে যে! তার ছেলের এত শক্তি!

এই দেখেই হাঁহাঁ বিপুল উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে লম্ফত্যাগ করেছিল! তার পরেই সে তিরবেগে দৌড়ে সেইখানে গিয়ে ধুপ করে বসে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি আগ্রহ-ভরে আগুনকে দুইহাতে ধরতে গেল—

এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে সেখানে থেকে ছিটকে দূরে সরে এল।

অ্যাঃ! এই খোকা-আগুনও এত জোরে কামড়ে দেয়!

হাঁহাঁ খানিকক্ষণ সভয়ে জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ডাকলে, ‘ধাঁধাঁ!

—বাবা!

—খোকা-আগুনকে কোথায় পেলি?

ধাঁধাঁ তার হাতের ডাল দুটো তুলে দেখালে। হাঁহাঁ তার কাছে গিয়ে অতি-কৌতুহলে ডাল দুটো নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। সে আগে যে দেশে ছিল সেখানে এ-জাতের গাছের ডাল দেখেনি। বুঝলে, এ হচ্ছে কোনও নতুন গাছের ডাল।

শুধোলে, এ ডাল কোথায় পেলি?

ধাঁধাঁ আঙুল দিয়ে পাহাড়ের একটা গাছ দেখিয়ে দিলে। সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে হঁহাঁ বুঝলে, হ্যাঁ, এ নতুন গাছই বটে। তারপর ছেলের কাছ

থেকে যে আশ্চর্য বিবরণ সংগ্রহ করলে সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই ধাঁধাঁ নিজের মনে এখানে খেলা করছিল। হঠাৎ তার কী খেয়াল হয়, ওই গাছের দুটো ডাল ভেঙে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ও ঘষাঘষি করতে থাকে, আর হঠাৎ অমনি আগুনের ফিনকি দেখা দেয়।

হাঁহাঁ ছেলের কথা শুনতে শুনতে ফিরে তাকিয়ে দেখে, ঝরনার পাশে আর খোকাআগুনের কোনও চিহ্নই নেই! কোথায় পালাল সে?

দ্রুতপদে ছুটে এসে দেখে, সেখানে আগুনের বদলে পড়ে রয়েছে খালি একরাশ ছাই!

হাতে পেয়েও আবার যাকে হারালে, তার শোকে হাঁহাঁ মাটির উপরে হতাশভাবে বসে পড়ল, কাঁদো-কাঁদো মুখে।

ধাঁধাঁ বাপের দুঃখের কারণ বুঝলে। সে তখনই হাঁহাঁর হাত থেকে ডালদুটো নিয়ে মাটির উপরে বসে আবার ঠুকতে ও ঘষতে লাগল। খানিক পরেই আগুনের ফিনকি দেখা দিলে, কিন্তু পলাতক খোকা-আগুন আর ফিরে এল না! ধাঁধাঁ এর রহস্য ধরতে পারলে না। সে জানে না যে একটু আগে দৈবগতিকে এখানে কতকগুলো শুকনো ঘাস ও লতাপাতা ছিল বলেই ফিনকির ছোয়ায় আগুন সৃষ্টি করেছিল!

কিন্তু ধাঁধাঁর চেয়ে তার বাপ হাঁহাঁর বুদ্ধি বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। দুঃখিতভাবে বসে বসে ছেলের বিফল চেষ্টা দেখতে দেখতে ধাঁ করে তার মাথায় এক বুদ্ধি জাগল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে এদিক-ওদিক থেকে সে এক রাশ শুকনো লতাপাতা ও ঘাস কুড়িয়ে আনলে। তারপর যেখানে তার ছেলে আগুনের ফিনকি জাগাচ্ছে সেইখানেই সেইগুলি নিয়ে রেখে দিলে। অল্পক্ষণ পরেই হল আবার খোকা-আগুনের আবির্ভাব!

আজ বিশ-শতাব্দীর তোমরা হয়তো ভাবছ, আগুনের ফিনকির মুখে শুকনো লতা-পাতা রাখলে যে জ্বলে উঠবে, এ সোজা বুদ্ধি তো খুব সহজেই

সকলের মনে আসে! হাঁহাঁ তো আর মায়ের কোলের খোকা নয়, এটুকু সে আন্দাজ করতে পারবে না কেন?

কিন্তু এই উপন্যাস পড়তে পড়তে তোমরা সর্বদাই মনে রেখো, আমি অজানা অনেক হাজার বৎসর আগেকার গল্প বলছি। আজকের পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুরা যা জানে, তখনকার বুড়োমানুষদেরও সে জ্ঞান ছিল না। বিশেষ এ জাতের গাছের ডালে ডালে ঘষাঘষির ফলে আগুনের জাগরণ হয়, এবং তার সাহায্যে শুকনো লতা-পাতা-ঘাসে স্থায়ী আগুনের উৎপত্তি হয়, এ জ্ঞান এখনকারও বনমানুষ বা গরিলা প্রভৃতির নেই। বেশি কথা কী, তারা আজও আগুন ব্যবহার করতে শেখেনি। তারা আজও পৃথিবীর আদিম অন্ধকারেই বাস করছে।

আমাদের সুদূর অতীত যুগের পূর্বপুরুষদের জন্ম, সেই আদিম অন্ধকারের গর্ভেই বটে কিন্তু তারা মানুষ বলেই মস্তিষ্ক চালনা করে বুঝতে পেরেছিল যে, আগুনের ফিনকি শুকনো লতা-পাতাকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে! সেই অন্ধকার-যুগের এই আবিষ্কার একালের যে কোনও বড়ো আবিষ্কারেরও চেয়ে বড়ো! মানুষের মাথায় ওই-শ্রেণীর মস্তিষ্ক যদি না থাকত, তাহলে আজ তোমাকে আমাকে গরিলা, ওরাং ও শিম্পাঞ্জির মতো গাছের ডালে-ডালেই নগ্নদেহে লাফালাফি করে বেড়াতে হত!...

শুকনো লতা-পাতা-ঘাসে আবার সেই আগুনের শিখা নেচে নেচে উঠল, হাঁহাঁ অমনি প্রচণ্ড আনন্দে ধাঁধাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে নৃত্য করতে করতে চেঁচিয়ে উচ্ছসিত স্বরে বললে, ধাঁধাঁ, ধাঁধাঁ, ধাঁধাঁঁ! তুই দেবতা, আমার ঘরে শিশু হয়ে এসেছিস! তোর মন্ত্রেই খুশি হয়ে আগুন-ভগবান আজ আমাকে দয়া করলেন?

অনেকক্ষণ নৃত্য করে হাঁহাঁর সাধ যখন মিটল, তখন সে ধাঁধাঁকে কোল থেকে নামিয়ে আগে সেই গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দেখে দেখে খুব

ভালো দেখে গাছকয়েক ডাল ভেঙে নিয়ে বললে, ধাঁধাঁ রে, এগুলো নিয়ে কি হবে বুঝেছিস?

ধাঁধাঁ বললে, উহু!

—এরা খাকা-আগুনকে ডেকে আনবে। খোকা-আগুন অন্ধকারকে বধ করবে।

আলো দিয়ে যে মানুষ অন্ধকার জয় করতে পারবে, সে-যুগে এও একটা মস্তবড়ো কল্পনা! আজ বিদ্যুৎকে বন্দি করে রাতকে তোমরা দিন করে ফেলেছ, সেকালের রাত্রি-বিভীষিকা তোমরা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না! শহর নেই, ঘরবাড়ি নেই, পাড়া-প্রতিবেশীর সাড়া নেই, কোথাও কোনওরকম আলোর চিহ্ন নেই, হু-হু করে কাঁদছে ভীরু বাতাস, মর-মরমর-মর করে কঁকিয়ে উঠছে মহা-অরণ্য, হুঙ্কার তুলে বিজন বনের পথে বিপথে হানা দিচ্ছে রক্তলোভী ভয়াবহ জন্তুরা—এবং তাদের সকলকে ঢেকে শব্দমাত্র সার করে রেখে চোখের সামনে বিরাজ করছে অনন্তরহস্যময় মৃত্যুর মতন ভীষণ, চিরমোন, দয়ামায়াহীন পৃথিবীব্যাপী অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার। তারই মধ্যে শীতার্ত রাতে কাঁপতে কাঁপতে ও দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে পড়ে প্রতি মুহুর্তে সাক্ষাৎ-মরণের স্বপ্ন দেখছে একটি অসহায় মানুষপরিবার! নিরেট আঁধারের কষ্টিপাথর ফুঁড়ে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে আর নিবে যাচ্ছে কী ওগুলো? রোমশ গণ্ডার, গুহাভালুক, নেকড়ে-বাঘের চোখ! শুকনো ঝরা-পাতার বিছানার উপর দিয়ে ক্রমাগত খড়মড় খড়মড় খড়মড় শব্দ জাগিয়ে যেন এগিয়ে আর এগিয়েই আসছে, কী ওটা রে? সর্পরাজ অজগর।

তখন বন্দুক জন্মায়নি, কোনওরকম ধাতুতে গড়া অস্ত্রের কথাও কেউ জানে না, মানুষের দুর্বল হাতের সম্বল কেবল লাঠি, পাথরের বর্শা, ছোরা-ছুরি! অন্ধকারের জন্যে তাও ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করবার উপায় নেই, কারণ কারুকেই চোখে দেখা যায় না! কেবল জ্বলন্ত চক্ষু, স্পষ্ট পদশব্দ—এবং প্রায়ই অতর্কিতে ভয়ঙ্কর দন্তনখরের সাংঘাতিক স্পর্শ ...তারপরেই হয়তো শোনা গেল, কোলের

খোকার কাতর চিৎকার! মা আকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আঁধার-সমুদ্রের মধ্যে, কিন্তু খোকার বদলে হাতে পেলে শক্ত মাটির বুক! তার অন্ধকারে অন্ধ দৃষ্টি কিছুই খুঁজে পেলে না—নীরব অন্ধকারের গর্ভে খোকার কণ্ঠ চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেল!...

আজকের আসন্ন সন্ধ্যায় পাহাড়ের উপরে সেই ভয়াল অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। বহুদূরের তাণ্ডব নৃত্যশালা ছেড়ে অরণ্যচারী দাবানলের শিখা যে এখানে এসে অন্ধকার দৈত্যকে হত্যা করতে পারবে না, হাঁহাঁ তা জানত। কাজেই সে সময় থাকতে সাবধান হয়ে ছেলের হাত ধরে গুহার দিকে ফিরতে লাগল।

হাঁহাঁ আকাশের দিকে তাকিয়ে এই ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হচ্ছিল, ওই সূর্য নিশ্চয়ই খুব ভালো ঠাকুর! মানুষকে তিনি ভালোবাসেন! তার অন্ধকার-শত্রুকে নিপাত করবার জন্যে তিনি রোজ সকালে পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু সন্ধে হলেই আবার পালিয়ে যান কেন?..

ঝরনার ঝির-ঝিরে গান ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে। বাতাসও ধীরে ধীরে যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। অরণ্যও যেন মৌনব্রত অবলম্বন করবার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমে রংমহলের আলো ক্রমে ক্রমে নিভে যাচ্ছে। পাহাড়ের আনাচ-কানাচ থেকে নিশাচর পাখিদের নিদ্রাভঙ্গের সাড়া!

আচম্বিতে তীব্র এক আর্তরবে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ক্রুদ্ধ গুহাভাল্লুকের ঘন ঘন গর্জন! হাঁহাঁ তখনই বুঝতে পারলে, এ হচ্ছে তার বউ হুয়ার কান্না। গুহাভালুক গর্জন করছে আর হুয়া কাঁদছে!

ধাঁধাঁ সভয়ে লাফ মেরে বাপের কাঁধের উপরে চড়ে বসল। চকমকি-পাথরের বর্শাটা প্রাণপণে চেপে ধরে হাঁহাঁ গুহার দিকে ছুটল, ঝড়ের মতো।

ভালুক আর ভালুক-বউ

কাঁধে খোকা-ধাঁধাঁ, এক হাতে চকমকি-পাথরের বর্শা এবং আর এক হাতে আগুন-গাছের ডালের গোছা,—হাঁহাঁ ধেয়ে চলেছে গুহার দিকে!

কী তার রুদ্র মূর্তি, কালভৈরবের কল্পনাও হার মানে! মাথার রুক্ষ কটা চুলগুলো ফণাতোলা সাপের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছিটকে উঠছে, গায়ের বড়ো বড়ো লোমগুলো উত্তেজনায় সজারু-কাঁটার মতন থেকে থেকে খাঁড়া হয়ে উঠছে এবং স্বভাবত বন্য ড্যাবডেবে চোখদুটো আর বিকশিত হিংস্র দাঁতগুলো সাংঘাতিক ক্রোধে চকচকিয়ে উঠছে—পুরাণে যেসব ভীষণ দৈত্য-দানবের গল্প পড়া যায়, হাঁহাঁ যেন তাদেরই একজন! দারুণ আক্রোশে হাঁহাঁ ফুলে ফুলে যেন দ্বিগুন হয়ে উঠেছে!

হাঁহাঁ প্রাণপণে ছুটছে বটে, কিন্তু আধুনিক মানুষের মতো দ্রুত ছোটা তার পক্ষে সম্ভব নয়! কারণ তার পায়ের চেটো সমানভাবে মাটিতে পড়ে না, তাই হেলে-দুলে টলে টলে ছুটতে হচ্ছে তাকে।

সূর্যহারা অস্তাচলে মস্ত একখানা ব্যস্ত মেঘ এসে সমুজ্জ্বল রক্তাক্ত আকাশকে যেন কোঁত করে গিলে ফেললে। পৃথিবীর শেষ আলোর আভাটুকুও যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। দূরে বহুদূরে অরণ্যব্যাপী দাবানলের লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধশিখা তখনও তার্থই-তার্থই নৃত্য করছে বটে, কিন্তু সে আলো এখানকার অন্ধকারকে তাড়াতে পারে না।

গুহার কাছ বরাবর এসেই হাঁহাঁ দেখতে পেলে, পাহাড়ের নীচের দিকে থেকে তার বড়ো ও মেজো ছেলে টুটু আর ঘটু চিৎকার করতে করতে বর্শা উচিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসছে। হাঁহাঁ কতকটা নিশ্চিন্ত হল তা'লে গুহাভালুকের সঙ্গে তাকে এক লড়াই করতে হবে না।

তারপরেই সে বিস্ফারিত চোখে দেখলে, গুহার ঠিক সামনেই ভয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে হুয়া হাঁটু গেড়ে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছে, এবং তার গলা দুইহাতে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে ছোটোখুকি।.....ওদিকে বেগে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে তেড়ে আসছে ভয়াবহ গুহাভালুক—তার মস্ত-বড়ো দেহটা যেন পুরু অন্ধকার দিয়ে গড়া, আর তার অতি-তীব্র চক্ষু দুটো যেন অগ্নি দিয়ে তৈরি! তীক্ষ্ণ লম্বা লম্বা দাঁত খিচিয়ে মাঝে মাঝে হেঁড়ে মুখ তুলে সে চিৎকার করে উঠছে, যেন কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ ডাকছে! ভালুক তখন হুয়ার কাছ থেকে মাত্র চৌদ্দ পনেরো হাত দূরে।

হঠাৎ হাঁহাঁর আবির্ভাবে ভালুক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আরও তেড়ে গর্জন করে উঠল এবং তার উত্তরে হাঁহার কণ্ঠেও জাগল আর এক বিষম গর্জন! হিংস্র জন্তুর সঙ্গে হিংস্র মানুষের গর্জনের পাল্লা! এবং সে-যুগে মানুষের গর্জনও জন্তুদের গর্জনের চেয়ে কম-ভয়ানক ছিল না! তুচ্ছ মানুষ তাকে চেঁচিয়ে ধমক দিতে চায় দেখে ভালুক ভারী খাপ্পা হয়ে উঠল। সে হুয়াকে ছেড়ে হাঁহাঁর দিকে এগুতে লাগল মনে-মনে এই ভাবতে ভাবতে—রোস হতভাগা, আগে মট করে তোর ঘাড় ভাঙি, তারপর তোর বউ আর মেয়েকে ধরে পেটে পুরে হজম করতে কতক্ষণ? হাঁহাঁ.চট করে ধাঁধাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে, যা, আমার পিছনে লুকিয়ে থাক! তারপর সে ভালুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, হাতের বর্শা মাথার উপরে জোর-মুঠোয় চেপে ধরে খুব সাবধানে পাঁয়তাড়া কষতে লাগল।

সেকালকার সেই অতিকায় গুহা-ভালুকের সুমুখে হাঁহাঁকে কী নগণ্যই দেখাচ্ছে! একালের ভালুকেরও সামনে কোনও আধুনিক মানুষই তুচ্ছ একটা চকমকি-পাথরের ভঙ্গুর বর্শা নিয়ে এমন বুক ফুলিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহস করত না। কিন্তু সে-যুগের মানুষকে বনে বনে সর্বদাই ঘুরে বেড়াতে হত বিশালকায় রোমশ হাতি, রোমশ গণ্ডার, ভালুক ও ভয়ানক সব বন্য জন্তুর সঙ্গে। তাদের অধিকাংশই ছিল মানুষের চেয়ে আকারে ও বলবিক্রমে অনেক বড়ো,

কিন্তু ওইসব হিংস্র বন্যজন্তুও ছিল তার খাদ্য। মানুষ তখন চাষবাষ করতে শেখেনি, মাংস না খেতে পেলে তার জীবনধারণ করাই চলত না। যদিও শিকার করতে গিয়ে মানুষদের প্রায়ই বন্যজন্তুদের উদরে সশরীরে প্রবেশ করতে হত, তবু ভালুক প্রভৃতিকে দেখলে আজ নগরবাসী আমরা যতটা ভয় পাই, সেকালকার বনবাসী মানুষরা ততটা পেত না। জানোয়ারদের তারা মনে করত, বিপজ্জনক খাবার মাত্র।

ভালুক পায়ে পায়ে এগুচ্ছে, হাঁহাঁর হাতের বর্শার দিকেই তার উদ্বিগ্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি! একবার আর একটা দুষ্ট মানুষ ওই-রকম একটা জিনিস ছুড়ে তাকে মেরেছিল এবং পায়ে চোট খেয়ে তাকে যে দুই-তিন মাস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে ভালুক-সমাজে হাস্যাম্পদ হতে হয়েছিল, সেগভীর লজ্জার কথা আজও সে ভুলতে পারেনি। ভালুক বুঝে নিলে, ওই জিনিসটাকে সামলাতে পারলেই যুদ্ধে জয় অনিবার্য। নইলে মানুষ তো ছার, এক চড়েই কুপোকাত হয়! হাঁহাঁ বর্শা তুলে ভাবছে, ভালুকটা আরও কাছে এলে তার কোনখানটায় আঘাত করা উচিত, এমন সময়ে হঠাৎ তার দুই পাশে এসে দাঁড়াল টুটু আর ঘটু! বয়স চব্বিশ ও বিশ– বিরাট-স্কন্ধ, কবাট-বক্ষ, সিংহ-কটি দীর্ঘ-বাহু, লৌহ পেশি! শক্তিচঞ্চল যৌবনের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। তারাও সুমুখের দিকে বাঁ পা বাড়িয়ে বুক চিতিয়ে চকমকি-বর্শা শূন্যে তুলল! পাহাড় ভেঙে এতখানি পথ উর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে এল, তবু তারা একটুও হাঁপাচ্ছে না—এমনি তাদের দম! ভালুক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে গোয়ারও নয়, নির্বোধও নয়। ভাবতে লাগল, শত্রুর সংখ্যা তিনজন, আর কি অগ্রসর হওয়া উচিত?

আচম্বিতে তার নাকের ডগায় এসে পড়ল ঠকাস করে একটা বড়ো পাথর! সে আর দাঁড়াল না, কোনওদিকে তাকালেও না, বিশ্রী একটা গর্জন করেই চটপট দৌড়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল এই ভাবতে ভাবতে, পাথরটা ছুড়লে কোন বদমাইশ? ইস, নাকটা থেবড়ে গেল নাকি?

পাথরটা ছুড়েছিল হুয়া। স্বামী আর ছেলেদের দেখে তার সাহস ফিরে এসেছে।

হাঁহাঁ হাঁপ ছেড়ে দেখলে, ভালুকটা ক্রমেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ আরও উপর থেকে আর একটা গজন শোনা গেল। অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেন আব-একটা চলন্ত অন্ধকার নীচে নেমে আসছে! ভালুকি?

হাঁহাঁ সবাইকে ইশারা করলে, গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকতে। পৃথিবীতে তখন আলোকের মৃত্যু হয়েছে। গাছে গাছে ভীত বাতাসের কান্না। বনে বনে কোনও জন্তুর নির্দয় শিকার-সংগীত, কোনও জন্তুর কাতর আর্তনাদ। ঝোপে ঝোপে জ্বলন্ত চক্ষু—দিকে দিকে আতঙ্কের আবছায়া।

হাঁহাঁ এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে নিজেও গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। এত বিপদেও বা হাতে সে আগুন-কাঠের গোছা ঠিক চেপে ধরে আছে!

ওদিকে গুহার খানিক উপরে ভালুকের সঙ্গে দেখা হল ভালুকির।

ভালুকি নিজের নাক দিয়ে ভালুকের আহত রক্তাক্ত নাক একবার শুকলে। তার মুখ দিয়ে কী-একটা শব্দ বেরুল—ভালুক-ভাষায় বোধহয় জিজ্ঞাসা করলে, এ কী কাণ্ড?

ভালুকও যেন লজ্জিতভাবে কী-একটা শব্দ করলে! বোধহয় বললে, গিন্নি, মানুষের হাতে মার খেয়েছি।

ভালুকি স্বামীর নাকের রক্ত চেটে দিতে লাগল, সস্নেহে।

খানিকক্ষণ কাটাল। ভালুক অস্ফুট গর্জন করে যেন বললে, চল গিন্নি, আবার আমরা গুহার দিকে যাই। পাজি মানুষগুলো অন্ধকারে দেখতে পায় না। এই ফাঁকে প্রতিশোধ নিয়ে আসি। তারা আবার নীচে নামতে লাগল।

হাঁহাঁদের উপরে তাদের রাগের আর একটা কারণ ছিল। দিন-তিনেক আগে হাঁহাঁদের গুহা ছিল ভালুকদেরই গুহা। ভালুকেরা দিন-দুয়েকের জন্যে দূর-বনে শিকার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, তাদের বাসা ঘৃণ্য মানুষদের হস্তগত হয়েছে! এমন অত্যাচার কে সইতে পারে? আকাশ যখন কষ্টিপাথরের মতন কালো-কুচকুচে, সন্ধ্যাবেলাকার সেই মেঘখানা যখন আরও নিবিড় হয়ে পাহাড়ের উপর ছুটে আসছে এবং সমস্ত অরণ্য যখন জানোয়ারদের বীভৎস চ্যাঁচামেচি ও হানাহানিতে পরিপূর্ণ, ভালুক ও ভালুকি তখন পা টিপে টিপে গুহার দরজার কাছে এসে হাজির হল। চন্দ্রহীন রাত্রি বনজঙ্গল পাহাড়কে নিজের কৃষ্ণাম্বরীর অঞ্চলে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল বটে, কিন্তু জানোয়ারি চোখ আঁধার ফুঁড়েও দেখতে পায়।

ভালুক দু পা এগিয়ে কান পেতে শুনলে, মানুষগুলো কী করছে?

গুহা স্তব্ধ। সবাই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

আরও দু পা এগিয়ে গিয়েই সে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারে যেন কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে—যেন কাঠে কাঠে ঘষাঘষির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে গুহার অন্ধকার যেন থেকে থেকে আলোহাসি হাসছে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ এমনি শব্দ করতে করতে গুহাভালুক বিপুল বিস্ময়ে আবার দু পা পিছিয়ে এল! এতকাল ভালুকিকে নিয়ে সে এই গুহায় বাস করেছে, কিন্তু ওখানকার অন্ধকার তো কখনও এমন বেয়াড়া বেমক্কা হাসি হাসেনি!

স্বামীর রকম-সকম দেখে ভালুকিও এগিয়ে এসে থ হয়ে গেল। এসব কী!

আচম্বিতে অন্ধকার অত্যন্ত অসম্ভব-রকম আলো-হাসি শুরু করে দিলে—এ হাসি আর যেন থামতেই চায় না! গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে, ছাদের তলায়, মেঝের উপরে হাসি খালি নেচে নেচে খেলে বেড়াতে লাগল। এবং ভালুক শাস্ত্র-

বহির্ভূত এমন আজগুবি ব্যাপার দেখে হতভম্ব স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কী যে তারা করবে, ভেবেই পায় না!

তারপরেই চকিতে একরাশি আলো-হাসি শুন্যে অজস্র আগুন-ফুল ঝরিয়ে ফুলঝুরির মতো ভালুক ও ভালুকির সর্বাঙ্গে এসে পড়ল! এ হাসি যে শত শত বিছার মতো কামড়ে দেয়—গা, হাত, পা, মুখ জ্বলিয়ে দেয়! বিকট চিৎকারে চতুর্দিকে কাঁপিয়ে তারা বিষম ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল!

গুহার ভিতরে তখন হাঁহাঁ বউ-ছেলে-মেয়েদের হাত-ধরাধরি করে মহা উল্লাসে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছে!

মানুষের সঙ্গে আজ থেকে হল আগুনের মিতালি। আগুন বন্ধুর মতো মানুষের হাতের খেলনা হয়ে তাকে বিশ্বজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কেবল কি বন্ধু? অগ্নি আজ থেকে হল মানুষের দেবতা।

হিন্দু ও পারসিরা আজও অগ্নিদেবের পূজার মন্ত্র ভোলেনি।

আদিম কালের বরযাত্রী

খোকা-আগুনকে ঘরে পেয়ে হাঁহাঁর আনন্দের আর সীমা নেই। আজ তার মনে হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীকে সে শাসন করতে পারবে। গুহাভালুক শায়েস্তা হয়েছে, এইবারে খোকা আগুনকে নিয়ে অন্যান্য শত্রুদেরও জব্দ করতে হবে।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই খোকা-আগুনকে বরাবর বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে হাঁহাঁ বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ফন্দি বার করে ফেললে।

তাদের গুহার মুখেই ছিল একটা দু হাত গভীর ও ছ-সাত হাত চওড়া গর্ত। হাঁহাঁ চারিদিক থেকে শুকনো ঘাস পাতা ও কাঠ কুটো এনে গর্তের অনেকখানি ভরিয়ে ফেললে এবং তার ভিতরেই করলে আবার খোকা-আগুনের সৃষ্টি। দেখতে দেখতে খোকা-আগুন মস্ত-বড় হয়ে উঠল!

হাঁহাঁ ছেলে-মেয়ে-বউকে হুকুম দিলে, যে যখন গুহার ভিতরে থাকবে, মাঝে মাঝে যেন গর্তে দু-একখানা কাঠ ফেলে দিতে ভুলে না যায়। এই উপায়ে গর্তের মধ্যে অগ্নি-দেবতাকে সে সর্বদাই বন্দী করে রেখে দিলে।

সন্ধ্যার পরে গুহার ভিতরে-বাহিরে জাগে আঁধার-দানব, তবু হাঁহাঁর আর ভয় হয় না। কারণ গুহার মধ্যে কুণ্ডে যখন অগ্নি-দেবতা নাচতে নাচতে রাঙা হাসি হাসতে থাকেন, আঁধারদানব তখন বাইরে পালিয়ে যেতে পথ পায় না।

কেবল আঁধার-দানব নয়, দুষ্টু শীতও দস্তুরমতো ঢিট হয়ে গেছে! একবার গুহায় ঢুকে কুণ্ডের পাশে এসে বসতে পারলেই হল,—ব্যাস, শীতের কাঁপুনি অমনি বন্ধ! কী মজা! কী আরাম!

গুহাবাসী ভালুক-ভালুকি সেদিনকার অপমান সহজে হজম করতে রাজি হয়নি। ক্ষুদ্র মানুষের এতবড়ো স্পর্ধার কথা ভালুক-সমাজে কে কবে শুনেছে? এর প্রতিশোধ না নিলেই নয়! বিশেষত সেইদিন থেকে ভালুকিও যেন তার স্বামীর প্রতি কতকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে শুরু করেছে! ভীষণ ভালুক-বংশে

জন্মগ্রহণ করেও যে দুর্বল মানুষের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে লম্বা দেয়, সে স্বামী নামেরই যোগ্য নয়, ভালুকির মনে বোধহয় এই ধরনের একটা ধারণা জন্মেছে; কারণ ভালুক ধমক দিলে ভালুকিও আজকাল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উলটো-ধমক দিতে ছাড়ে না। এমন অবাধ্য বউ নিয়ে কি ঘর-সংসার করা চলে? চটপট এর একটা প্রতিবিধান না করলেই নয়!

গুহাভালুক খুব-একটা ঘুটঘুটে রাতে পা টিপে টিপে গুহার কাছে খবরাখবর নিতে এল। মনে মনে এচে এসেছিল, একটু যদি ফাঁক পায়, তাহলে গুটিকয় চপেটাঘাত করে একটা মানুষেরও মুণ্ড আর আস্ত রেখে আসবে না—হু!

কিন্তু সেদিনও গুহার কাছে গিয়ে দেখলে, ভিতরকার অন্থকার ঠিক সেদিনকার মতোই বিদঘুটে হাসি হাসছে! খুব উঁচু হয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে ভালুক মহাবিস্মিতের মতো দেখলে, গুহার মুখেই দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে! বনের দাবানলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, গুহার দরজায় এসে প্রহরী হয়েছে সেইই! ও-পাহারা ভেদ করে ভিতরে ঢোকা অসম্ভব বুঝে ভালুক আবার সরে পড়ল মানে মানে। কী জানি বাবা, সেদিনকার মতো মানুষগুলো আবার যদি আগুনকে লেলিয়ে দেয়!

আরও কয়েকবার গুহার কাছে গিয়ে সে দেখে এল সেই একই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার! ভালুক লুপ্ত গৌরবকে আর উদ্ধার করতে পারলে না। ভালুকির ধমক খেয়েও মুখ বুজে থাকে।

মানুষের কাছে বনের পশু সেই যে জব্দ হতে আরম্ভ করলে আজও তার সমাপ্তি হয়নি। তবে তখন জুলত কেবল কাঠের আগুন, আর এখনকার আগুন জুলে বন্দুকের মুখে।

আরও কিছুদিন যেতে-যেতেই আর এক অপূর্ব আবিষ্কার। এবং এবারকার আবিষ্কারের জন্যে বাহাদুরি নিতে পারে, ধরতে গেলে হাঁহাঁর বউ হুয়াই। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছি, হাঁহাঁ হচ্ছে

নিয়ানডেটাল জাতের মানুষ এবং এজাতের মানুষরা চাষবাস করতে শেখেনি। তারা জীবনধারণ করত প্রধানত শিকার করে এবং যেদিন শিকার জুটত না, ক্ষুধা মেটাত ফলমূল খেয়ে।

একদিন হাঁহাঁর বরাত খুব ভালো। টুটু আর ঘটু দুই ছেলের সঙ্গে বনে বেরিয়ে শিকার করে আনলে মোটাসোটা মস্ত এক বুনো মহিষ। মহিষটাকে দেখেই হুয়া, তার বড়োমেয়ে নিনি ও ছোটোখোকা ধাঁধাঁ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। কারণ এমন একটা প্রকাণ্ড মহিষের মাংস তাদের পেটের ভাবনা ভুলিয়ে দেবে অন্তত দিন-কয়েকের জন্যে। সেই আদিম যুগের মানুষরা মাংস কোন জন্তুর এবং তা পচা কী টাটকা, এসব বাছ-বিচার করত না একটুও। বহুত দুঃখে, বহু দিনের পর এক-একটা বড়ো শিকার মেলে। মাংস টাটকা রাখবার উপায় তখন কেউ জানত না এবং এমন দুর্লভ জিনিস পচা বলে ফেলে দেওয়াও ছিল অসম্ভব। সাত-আটদিনের পচা মাংসও তখন যে কেউ খেত না, এ-কথাও জোর করে বলা যায় না!

হুয়া আর নিনি মায়ে-ঝিয়ে চকমকি পাথরের ছুরি নিয়ে মাংস কাটতে বসে গেল মহাউৎসাহে এবং খোকা ধাঁধাঁ করতে লাগল তাদের সাহায্য। তখন থেকেই মেয়েরা গৃহস্থালির এসব কাজ করে নিয়েছিল নিজস্ব।

সেদিন একটু শীত পড়েছিল। হাঁহাঁ অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে মেঝের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে কিঞ্চিৎ আরামের চেষ্টা করতে লাগল।

টুটু আর ঘটুর জোয়ান বয়স, তাদের এখনই বিশ্রামের দরকার হল না। তারা গুহার বাহিরে গিয়ে চকমকি পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে বসল। তখন লোহা বা অন্য কোনও ধাতুর অস্তিত্বও কেউ জানত না। চকমকি পাথরের সাহায্যেই চকমকি পাথর কেটে বা ঘষে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হত। আজ কত হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে সেইসব অস্ত্রশস্ত্র আবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যাদুঘরে গিয়ে তোমরা সেসব দেখে আসতে পারো স্বচক্ষে।

সংসারের কর্তাকে সবচেয়ে ভালো খাবার দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছিল তখন থেকেই। নইলে সে-যুগের অসভ্য কর্তারা স্ত্রীর মাথায় মারত ডান্ডা, আর এ-যুগের কর্তারা মনের রাগ জানিয়ে দেন কেবল মুখভার করেই, নিতান্ত সভ্যতার অনুরোধেই!

খুব-বড়ো ও খুব-ভালো একখণ্ড মাংস নিয়ে হুয়া চলল স্বামীকে খেতে দিতে। মাংস না রেঁধেই খেতে দেওয়ার কথা শুনে তোমরা কেউ অবাক হয়ে না। মনে রেখো, গৃহস্থালিতে বশীভূত আগুনের সৃষ্টি হয়েছে তখন সবে। আগুন দিয়ে যে আবার রান্না হয়, এটা ছিল তখন কল্পনাতীত।

গুহামুখে অগ্নিকুণ্ডের পাশ দিয়ে যাতায়াতের পথ ছিল অতিশয় সংকীর্ণ। সেইখান দিয়ে যেতে গিয়ে হুয়া হঠাৎ পড়ে গেল। নিজেকে কোনও রকমে আগুনের কবল থেকে সামলে নিলে বটে, কিন্তু তার হাত ফসকে মাংসটা পড়ল গিয়ে একেবারে জ্বলন্ত কুণ্ডের মধ্যে।

—করলি কী বউ! আমন মাংসটা নষ্ট করলি?

হুয়া তাড়াতাড়ি উঠে বসে ভয়ে-ভয়ে অপ্রতিভভাবে বললে, আমাকে মাফ করো! তারপর দুই খণ্ড কাঠ দিয়ে মাংসটা অগ্নিকুণ্ডের গর্ভ থেকে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

হাঁহাঁ বললে, থাক, আর তুলে কাজ নেই। ও মাংস নষ্ট হয়ে গেছে, আমি খাব না।

হুয়া বললে, হোক-গে নষ্ট! ও-মাংস আমিই খাব, তোমাকে ভালো মাংস এনে দিচ্ছি।

হাঁহাঁ আবার শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর হুয়া মাংসটাকে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার করলে। তারপর সেটাকে সেইখানে রেখে স্বামীর জন্যে নতুন মাংস আনতে ছুটল।

অল্পক্ষণ পরেই হাঁহাঁ তার খাবার পেল। এবং হুয়াও স্বামীর পাশে বসে সেই আধ-পোড়া মাংসের উপরে মারলে এক কামড়।

দাঁত দিয়ে খানিকটা মাংস ছিড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে হুয়া বিস্মিত স্বরে বললে, ওগো!

হাঁহাঁর বড়ো বড়ো দাঁতগুলো তখন মড়-মড় শব্দে হাড় চিবেচ্ছিল। জড়িত স্বরে সে বললে, কী?

—এই মাংসটা একটু খাবে?

—ধ্যাত?

—না, একটু খেয়ে দ্যাখো! কী চমৎকার লাগছে!

—বাজে কথা!

—এক টুকরো চিবিয়ে দ্যাখো! এমন মাংস কখনও খাওনি!

হাঁহাঁও খাবে না, হুয়াও ছাড়বে না! স্ত্রীর আবদারে বাধ্য হয়ে শেষটা সে অত্যন্ত নারাজের মতো এক টুকরো আধ-পোড়া মাংস নিয়ে চেখে দেখলে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ-চোখের ভাব হয়ে গেল অন্যরকম!

হুয়া বললে, কী?

—আশ্চর্য।

—চিমৎকার নয়?

—আর-একটু দে!

হুয়া দাঁত দিয়ে আর এক টুকরো মাংস ছিড়ে নিজের হাতে স্বামীর মুখে পুরে দিলে। হাঁহাঁ তারিয়ে তারিয়ে চিবোতে চিবোতে অভিভূত স্বরে বললে, খাসা।

হুয়া বললে, কাল থেকে আমি এইরকম মাংসই খাব!

হাঁহাঁ বললে, ‘কাল থেকে কেন? আমার এই মাংসটা আজকেই ওইখানে ফেলে দে দেখি!

হুয়া আবার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হাঁহার মাংস ফেলে দিলে। কিছুক্ষণ পরে দুই খণ্ড কাঠের সাহায্যে সেটাকে তুলে নিয়ে হাঁহাঁর হাতে দিয়ে বললে, চেখে দ্যাখো!

হাঁহাঁ সেই মাংসের খানিকটা মুখে পুরে উত্তেজিত স্বরে বললে, চমৎকার, চমৎকার! আগুন-ঠাকুরের জয় হোক! হুয়া, আয় আমরা দেবতাকে গড় করি!

হাঁহাঁ এবং হুয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের সামনে মাটিতে মাথা রেখে সানন্দে প্রণাম করলে! অগ্নিদেবতা কেবল শত্রুর কবল থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন না, কেবল আঁধার-দানবকে দূরে তাড়িয়ে দেন না, সেইসঙ্গে উদরের খোরাককেও সুধার মতন মধুর করে তোলেন। না-জানি দেবতার আরও কত গুণ আছে!

হাঁহাঁ সানন্দে চিৎকার করে ডাকলে, ওরে টুটু, ঘটু, নিনি, ধাঁধাঁ! আয় রে তোরা সবাই! নতুন খাবার খাবি আয়!

সেইদিন থেকে হল মানুষের গৃহস্থালিতে রন্ধন-শিল্পের আবিষ্কার! সাধারণ জানোয়ারদের শ্রেণী ছেড়ে মানুষ উঠল আর-এক ধাপ উঁচুতে।

হাঁহাঁ আর হুয়ার আদরের বড়ো মেয়ে নিনি, বয়স তার ষোলো বৎসর। বাপ-মা বলে, নিনির চেয়ে সুন্দর মেয়ে দুনিয়ায় আর জন্মায়নি। কিন্তু তোমরা তাকে দেখলে ও-কথা মানতে রাজি হতে না নিশ্চয়ই। প্রথম পরিচ্ছেদেই হাঁহাঁর চেহারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নিনি সেই বাপেরই মেয়ে তো, বাপের চেহারার বর্ণনা পড়লেই মেয়ের চেহারা খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে। নিনি হচ্ছে আদিম যুগের বনের মেয়ে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দুর্দান্ত বলিষ্ঠতা ও বন্য স্বাস্থ্যের ভাব ফুটে উঠছে। তোমাদের একালের দুই-তিনজন যুবা একসঙ্গে চেষ্টা করেও গায়ের জোরে নিনিকে বশ মানাতে পারত না।

বনবালা নিনি আজকাল ভারী বিপদে পড়েছে। ঝরনার ধারে যখন জল আনতে যায় রোজই দেখতে পায়, পাথরের উপরে পা ছড়িয়ে বসে থাকে এক

ছোকরা। বনে-জঙ্গলে যখন কাঠ বা ফলমূল কুড়োতে যায়, আনাচে-কানাচে দেখা যায় সেই ছোকরাকেই।

ছোকরাকে দেখতে তার ভালোই লাগে। সে যে তাকে বিয়ে করতে চায়, এটাও নিনি বুঝতে পারে। তবু বিয়ের নামেই তার ভয় হয়। সেকালের বিয়ে, বর তাকে জোর করে ধরে কোথায় নিয়ে যাবে, বাপ-মাকে দেখতে পাবে না আর জন্মের মতো। বাপ-মা ভাই-বোনকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন করে? তাই ছোকরাকে দেখলেই ভীরু হরিণীর মতো ছুটে পালিয়ে আসে।

তোমরা জানো না বোধহয়, সেকালের বিয়েতে বাপ-মা বা ঘটকঠাকুরের হাত থাকত না প্রায়ই। কোনও মেয়েকে পছন্দ হলে বর জোর করে তাকে ধরে বা চুরি করে নিয়ে সরে পড়ত। আজও কোনও কোনও অসভ্য সমাজে এই নিয়ম বজায় আছে। মহাভারত প্রভৃতি কাব্য পড়লে দেখবে, ভারতবর্ষ যখন সভ্য তখনও বিবাহের জন্যে কন্যাহরণ নিষিদ্ধ ছিল না। মহাবীর অর্জুনও করেছিলেন সুভদ্রাকে হরণ এবং রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেদিন বৈকালে হাঁহাঁ সকলকে নিয়ে কুণ্ডের চারিপাশে বসে আগুন পোয়াচ্ছে, কেবল নিনি গেছে ঝরনায় জল আনতে।

হঠাৎ নিনি একরাশ এলোচুল হাওয়ায় উড়িয়ে বেগে ছুটতে ছুটতে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং বাপের পায়ের কাছে বসে পড়ে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগল।

হাঁহাঁ সবিস্ময়ে বললে, কী রে নিনি?

—তারা আমাকে ধরতে আসছে!

—তারা? কারা?

—যারা আমাকে বিয়ে করবে।

—হাঁহাঁর দুই চোখ জ্বলে উঠল। সগর্জনে বললে, কী করবে? বিয়ে?

—হ্যাঁ বাবা! সে রোজ একলা আসে। আজ অনেক লোক নিয়ে এসেছে।

—কোথায় তারা?

—বাইরে। বোধহয় এইখানেই আসছে।

হাঁহাঁ, টুটু, ঘটু একসঙ্গে এক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল, এক একটা পাথরের ফলাপরানো বর্শা হাতে করে। যদিও এইভাবেই তখনকার অধিকাংশ বরই বউ সংগ্রহ করত, তবু কোনও বাপই সহজে নিজের মেয়েকে পরের হাতে বিলিয়ে দিতে রাজি হত না। এইজন্যে আদিম যুগের বিবাহের সময়ে প্রায়ই রক্তারক্তি ও খুনোখুনি কাণ্ডের অবতারণা হত, অনেক সময়ে বরও মারা পড়ত এবং কন্যাপক্ষের আক্রমণে বরযাত্রীরা করত প্রাণপণে পলায়ন।

হাঁহাঁ তার দুই ছেলেকে নিয়ে প্রচণ্ড স্বরে চিৎকার করতে করতে মাথার উপরে বর্শা নাচাতে নাচাতে এবং বড়ো বড়ো লাফ মারতে মারতে বাইরে বেরিয়ে গেল। হুয়া তার মেয়েকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে ভয়ে-দুঃখে কান্না শুরু করে দিলে। মেয়ের বিয়েতে মায়ের প্রাণ আজও কাঁদে—কত-যুগ-যুগান্তরের বেদনা সেখানে সঞ্চিত আছে।

গুহার বাইরে গিয়ে হাঁহাঁ দেখে, ব্যাপার বড়ো গুরুতর। আঠারো-বিশজন লোক কেউ লাঠি কেউ বর্শা আস্ফালন করতে করতে হই-হই রবে পাহাড়ের উপরে তাদের দিকে উঠে আসছে!

তারা তিনজনে, এই দলে-ভারী বরযাত্রীদের ঠেকাবে কেমন করে?

ফুসমন্তর

সব-আগে আসছে সেই ছোকরা, নিনিকে যে বিয়ে করতে চায়!

আগেই বলেছি, নিনিরও পছন্দ হয়েছে এই ছোকরাকে।

কিন্তু কী দেখে যে পছন্দ হয়েছে, আমরা একালের লোক তা বুঝতে বা বলতে পারব না। নিনির পছন্দসই এই বরটির প্রায় গরিলার মতো মুখ, জঙ্গলের ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো রাশীকৃত গোঁফ-দাড়ি এবং সর্বাঙ্গে বন্য জন্তুর মতো বড়ো বড়ো লোম দেখলে একালের যেকোনও মহা-কুৎসিত মেয়েও 'মাগো' বলে লম্বা দৌড় মেরে দেশছাড়া হয়ে পালাবে।

তবে এইটুকু মনে রেখো, নিনি জীবনে যত মানুষ দেখেছে তাদের সকলেরই চেহারা ওইরকম। একালেও ভারতের কোনও বউই আফ্রিকার কাফ্রি বা হটেনটট বরকে বিয়ে করতে চাইবে না। কী কাফ্রি বা হটেনটটদের মুলুকে সেই বরকেই হয়তো অপরূপ কার্তিক বলে মনে করা হয়।

নিনির বরের নামটিও বেশ। টুঁটুঁ।

রূপের কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু টুঁটুঁর দেহের দিকে তাকালে তারিফ করে বলতে হয়—হ্যাঁ, সত্যিকার পুরুষের চেহারা বটে। ইয়া চওড়া বুকের পাটা, তার উপরে পড়লে পাথরও যেন ভেঙে যায়! ইয়া দুই আজানুলম্বিত বাহু, তাদের লোহার মতো কঠিন পেশিগুলো থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে!

বড়যাত্রীদের পলটন দেখে রীতিমত ভড়কে গিয়ে হাঁহাঁ, টুটু আর ঘটু চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা সবাই বুঝলে, ওদের বাধা দিতে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা। শেষ পর্যন্ত নিনিকে ওরা ধরে নিয়ে যাবেই।

কিন্তু বিনাবাক্যব্যয়ে এতদিনের পালন-করা মেয়েকে কি হাতছাড়া করা যায়? অতএব হাঁহাঁ মুখশাবাশি দেখিয়ে খুব চিৎকার করে বলে উঠল, হো! কে রে তোরা?

ঢুঁঢুঁ বললে, আমরা আসছি বাঘ-বন থেকে, সেই যেখানে খাঁড়াদেঁতোরা থাকে।

—কী চাস রে?

—তোর জামাই হব রে!

—আমার জামাই হবি? হা-হা-হা-হা!

—অত হাসছিস যে?

—তুই হবি নিনির বর ও হো হো হো হো!

—কেন হব না রে; আমার হাতের এই ডান্ডাটা দেখছিস তো?

—কী রে, ভয় দেখাচ্ছিস নাকি? ডান্ডা বুঝি আমাদের নেই?

ততক্ষণে বরযাত্রীরা আরও কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ তাদের ভিতর থেকে একজন খুব লম্বা-চওড়া লোক সবচেয়ে বেশি এগিয়ে এল। তার কাচা-পাকা মাথার চুলের উপরে রঙিন পালকের চুড়ো; তার গলায় দুলছে সাদা ধব-ধবে হাড়ের মালা; তার একহাতে পাথরের বর্শা, আর এক হাতে পাথরের কুঠার; ভাবভঙ্গি ভারিক্কি,—দলের সর্দারের মতো।

হাঁহাঁ শুধোলে, তুই আবার কে রে বুড়ো?

—আমি ঢুঁঢুঁর বাপ হুঁহুঁ রে!

—তোর মতলব কী?

—আমি ব্যাটার বউকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—আবদার নাকি?

—আবদার নয় রে, দাবি। দে বউকে শিগগির বার করে।

হাঁহাঁ রাগ সামলাতে না পেরে ধাঁ করে একখানা পাথর ছুঁড়লে! কিন্তু ঢুঁঢুঁর বাপ হুঁহুঁ সাত করে একপাশে সরে গিয়ে পাথরখানা ব্যর্থ করে দিলে।

বরযাত্রীরা হই-হই করে উঠল, তারপর খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল এবং এগিয়ে আসতে-আসতেই পাহাড় থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ক্রমাগত।

হঠাৎ কী একটা কথা মনে করে হাঁহাঁ হো-হো রবে চ্যাঁচাতে ও তড়াক তড়াক করে লাফাতে লাগল। এক-একটা লাফ তিন-তিন ফুট উঁচু! একখানা বড়োসড়ো পাথর তার পায়ে এসে লাগল, তবু তার চ্যাঁচানি আর নাচ বন্ধ হয় না!

টুটু আর ঘটু বুঝলে, তাদের বাপ হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে!

ঢুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ আশ্চর্য হয়ে বললে, ওটা অত চ্যাঁচায় আর লাফায় কেন রে?

ঢুঁটুঁ বললে, বোধহয় তুকতাক করছে!

হুঁহুঁ বললে, ডান্ডার চোটে সব তুকতাক ঠান্ডা করে দেব! এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!

টুটু বাপের বা হাত জোরে চেপে ধরে বললে, ও বাবা, তোর ঘাড়ে কি ভূত চাপল?

ঘটু বাপের ডান হাত পাকড়ে বললে, আর নাচিসনে রে বাবা!

হাঁহাঁর দুই হাত ধরে ঝুলছে দুই ছেলে, সে কিন্তু সেই অবস্থাতেও লাফাবার চেষ্টা করতে লাগল!

—বাবা, বাবা, ওরা যে এসে পড়ল!

—আসুক রে, আসুক!

—সে কী বাবা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচবি, আর ওরা এসে আমাদের মেরে ফেলবে?

—তারপর নিনিকে নিয়ে পালাবে?

হঠাৎ হাঁহাঁ নাচ থামিয়ে গম্ভীর-স্বরে বললে, চল, আমরা নিনির কাছে যাই।

—লড়াই করবি না?

—না?

—নিনিকে ওদের হাতে তুলে দিবি?

—না।

—তবে?

—আমার সঙ্গে আয়।

হাঁহাঁ গুহার দিকে দৌড় মারলে।

বাপের কাপুরুষতায় বিস্মিত ও মর্মাহত হয়ে টুটু বললে, ঘটু!

—কী রে টুটু?

—স্ত্রীলোকের মতো গর্তে গিয়ে ঢুকবি, না এইখানে দাঁড়িয়ে মরদের মতো লড়বি?

—মরদের মতো লড়ব।

—হ্যাঁ, মরব—তবু নড়ব না।

—আমার হাতে বর্শা—

—আমার হাতে কুড়ুল।'

তার বর্শা আর কুঠার নিয়ে পাঁয়তাড়া শুরু করলে, এমন সময়ে গুহার ভিতর থেকে হাঁহাঁর ডাক এল—টুটু! ঘটু!

—বাবা?

—শিগগির এখানে আয়!

—যাব না!

বজ্রকঠোর কণ্ঠে হাঁহাঁ বললে, আমার হুকুম। এদিকে আয়!

মান্ধাতার আমলেরও আগেকার কথা। তখনও ছেলেরা বাপের কথার অবাধ্য হতে শেখেনি হয়তো।

টুটু বললে, ঘটু!

—কী রে টুটু?

—বাপ ডাকে।

—হু। না গেলে মারবে।

আবার হাঁহাঁর স্বর—টুটু! ঘটু! এখনও এলি না?

—যাই বাব!

—দৌড়ে আয়!

টুটু আর ঘটু গুহার দিকে দৌড়তে লাগল।

বরযাত্রীরা এসে পড়ল।

টুঁটুঁ বললে, ভিতুগুলো লড়বে না। পালাল।

হুঁ হুঁ বললে, কিন্তু পালিয়েই কি বাঁচবে?

—এখন আমরা কী করব রে?

—গুহায় ঢুকব।'

—যদি সেখানে ওরা লড়ে?

—ওরা তিনজন, আমরা আঠারোজন। টিপে মেরে ফেলব।

—চল তবে?

মহা হট্টগোল তুলে সবাই গুহার দিকে ছুটল। টুঁটুঁ আর হুঁহুঁ সকলের আগে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে নিজেদের লোকজনদের ডেকে বললে, আয় রে তোরা ছুটে আয়!

তারপর গুহার দিকে ফিরে টুঁটুঁ বললে, ওরে বুড়ো শ্বশুর! আমার বউ দে!

হুঁহুঁ বললে, বউ দে রে, আমার ব্যাটার বউ দে!

গুহার ভিতর থেকে হাঁহাঁ জবাব দিলে, এই নে রে, এই ন!

পরমুহূর্তে, দুখানা জুলন্ত চ্যালাকাঠ গুহার ভিতর থেকে সাঁ সাঁ করে উড়ে এল—একখানা পড়ল ঢুঁঢুঁর চ্যাটালো বুকের উপরে এবং আর একখানা লাগল গিয়ে হুঁহুঁর মস্ত মুখের উপরে!

এবং তার পরমুহূর্তে গুহামধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত জ্বলন্ত কাঠের পর জ্বলন্ত কাঠ! হাঁহাঁ, টুটু, ঘটু, ধাঁধাঁ, হুয়া আর নিনি,--এই আগুনখেলায় যোগ দিয়েছে প্রত্যেকেই। নিনির বিশেষ লক্ষ্য, ঢুঁঢুঁর দিকেই। তার ছোড়া একখানা কাঠের আগুনে ঢুঁঢুঁর গোফ-দাড়ির ভিতরে সৃষ্টি করলে ফিনকির ফুলঝুরি।

খিল-খিল করে হেসে সকৌতুকে হাততালি দিয়ে নিনি বলে উঠল, পালিয়ে যা রে বর, পালিয়ে যা।

পালিয়েই গেল! খালি নিনির বর নয়, সবাই। আর সে কী যে-সে পালানো? এত চটপট মানুষ যে পালাতে পারে, নিনি তা জানত না। তাদের কান্নায় আর সভয় চিৎকারে উপরপাহাড়ে গুহাভালুকের ঘুম গেল ভেঙে। ব্যাপার কী দেখবার জন্যে সে পাহাড়ের ধারে এসে মুখ বাড়ালে।

দেখলে একদল মানুষ পাগলের মতো দৌড় মারছে এবং তাদের পিছনে পিছনে ছুটছে হঁহাঁ, টুটু আর ঘটু—প্রত্যেকেরই দুহাতে দুখানা করে জ্বলন্ত কাঠ।

বুদ্ধিমান ভালুক ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলে। হাঁহাঁদের কেউ পাছে তাকেও দেখে ফেলে, সেই ভয়ে সে চট করে পাহাড়ের ধার থেকে সরে এল। সুমুখের দুই পায়ে ভর দিয়ে থেবড়ি খেয়ে বসে ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। ভেবে ভেবে শেষটা স্থির করলে, এই অভিশপ্ত পাহাড় যে-কোনও ভদ্র ভালুকের বাসের অযোগ্য! এখানে যেসব কাণ্ড ঘটতে শুরু হয়েছে, তার একটুও মানে হয় না। কালই অন্য দেশে যাত্রা করতে হবে।

একটা পাহাড়ে-গাছের ছায়ায় বসে ভালুকি তখন চোখ বুজে থাবা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল পরম আরামে। স্বামীর পায়ের শব্দে কুঁতকুঁতে চোখদুটি খুললে।

ভালুকির নাকে নিজের নাক লাগিয়ে ভালুক ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল। আমরা—অর্থাৎ মানুষরা বড়োজোর অন্যের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলি। কিন্তু ভালুক বউয়ের নাসিকায় নিজের নাসিকা সংলগ্ন করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে কেন, বলতে পারি না। হয়তো এই উপায়ে তাদের কথা কইবার সুবিধা হয়।

স্বামীর ঘোঁৎঘেতানি শুনে ভালুকিও করলে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ বোধহয়, বললে, ওমা, তাই নাকি? এবার ভালুকের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ বোধহয় বললে, হ্যাঁ, গিন্নি। এ পাহাড় আর নিরাপদ নয়। মানুষের সঙ্গে আগুনের ভাব হয়েছে। এসো, লম্বা দি।

ভালুকির আপত্তি হল না। এ-পাহাড়ে যত মৌচাক লুঠে সব মধু সে শেষ করেছে। এখন নতুন দেশের খবর নেওয়াই ভালো।

গুহাভালুক বউ আর দুটি বাচ্চা নিয়ে যখন দেশত্যাগী হল, ঠিক সেই সময়ে ঢুঁঢুঁর বাপ হুঁহুঁ দলবল নিয়ে একটা মস্তবড়ো বুড়ো বটগাছের তলায় গিয়ে বসে পড়ল। তাদের কারুরই হাতে আর একটা অস্ত্রও নেই। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তারা হাঁহাঁদের গুহার সুমুখে ফেলে পালিয়ে এসেছে।

হুঁহুঁ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে বললে, ‘ওরে ঢুঁঢুঁ!

—কী রে বাবা?

—আমরা কি স্বপ্ন দেখলুম?

—স্বপ্ন নয়, সত্যি। স্বপ্ন কামড়ে দিলে কি গোঁফ-দাড়ি পুড়ে যায়? গায়ে ফোসকা হয়?

—কেন তোর বউ আনতে এলুম রে টুটু, জুলে-পুড়ে মলুম যে!

—‘আগুন-দেবতা যার হাতের মুঠোয়, সে যে এইবারে পৃথিবী জয় করবে। আর আমাদের রক্ষে নেই।

—ঢুঁঢুঁ, তুই তখন ঠিকই বলেছিলি রে! তখন ও-বেটা পাগলার মতন লাফিয়ে সত্যি সত্যিই তুক করছিল।

—ওর ফুসমন্তরে আগুনঠাকুর বশ মেনেছে।

—হুঁ। কিন্তু ও-মন্তরটা আমরাও কি শিখতে পারি না?

—কেমন করে শিখবি বাবা? ফুসমন্তর কি কেউ কারুকে শেখায়?

—ওর বেটিকে তুই যেমন করে পারিস বিয়ে করে ফেল। ওর বেটিও নিশ্চয় বাপের কাছ থেকে মন্তর-তত্তর শিখেছে।

—গড় করি বাবা, আর আমি ও-মুখো হই?..ওই দ্যাখোরে বাপ, আবার ওরা এসেছে।

ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে হুঁহুঁ সচমকে দেখলে, তাদের খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে হাঁহাঁ, দুই পাশে টুটু আর ঘটুকে নিয়ে। কখন যে তারা নীল অরণ্যের যবনিকা ভেদ করে এত কাছে এসে আবির্ভূত হয়েছে হুঁহুঁর দলের কেউই তা টের পায়নি। কেবল তাই নয়, তাদের তিনজনেরই বাঁ হাতে একখানা করে জুলন্ত কাঠ এবং ডান হাতে একগাছা করে বর্শা। প্রত্যেকের কোমরেও ঝুলছে কুঠার।

একে হুঁহুঁদের সবাই অস্ত্রহীন, তার উপরে আবার এই অগ্নিবিভীষিকা! তারা সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিলে, কারণ পালাবার আগেই ওরা আক্রমণ করবে!

হাঁহাঁ মুখ টিপে টিপে বিজয়-হাসি হাসছিল। হাসতে-হাসতেই বললে, কী রে ঢুঁঢুঁর বাপ হুঁহুঁ! আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যাবি তো এগিয়ে আয়!

ঢুঁঢুঁ বললে, রক্ষে করো, আমার বিয়ের শখ নেই!

হুঁহুঁ হাত জোড় করে বললে, আমি মাফ চাইছি রে!

—কী শর্তে মাফ করব, বল।

—আজ থেকে তুই হলি আমাদের প্রভু রে, আর আমরা হলুম তোর দাস।

—আজ থেকে আমি যা বলব, শুনবি?

—মরব।

—সূর্যিঠাকুরের নাম নিয়ে দিব্যি গাল।

পশ্চিম গগনের প্রদীপ্ত রক্ত-গোলকের দিকে দৃষ্টিপাত করে হুহঁ বললে, ওই সূর্যিঠাকুর সাক্ষী রইল, তুই প্রভূ—আমরা দাস। আমরা বিপদে পড়লে তোকে কিন্তু আগুন-মন্তরে রক্ষা করতে হবে!

—রক্ষা করব?

—বিপদ আমাদের শিয়রে জেগেই আছে। আমাদের বাঘ-বনে খাঁড়াদেঁতোদের বিষম উপদ্রব। তুই তাদের তাড়াতে পারবি?

—পারব।

—আমাদের পাশের বনে অনেক-রকম ভয় আছে। তুই তাদের দূর করতে পারবি?

—কেন পারব না রে; গুহাভালুক খাঁড়াদেঁতো বাঘ, ভূতপ্রেত সকল রকম ভয় দূর হয়ে যায় আমার এই আগুন-মন্তরে! এই মন্তরে অন্ধকারকে মেরে রাতকে আমি দিন করতে পারি! আজ থেকে আমি রইলুম তোদের শিয়রে দাঁড়িয়ে, কোনও শত্রুই আর তোদের কাছে আসবে না!

এই কথা শুনেই হুঁহুঁর দলবল গায়ের সব জ্বালা ভুলে গেল, তারা এক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, জয়, জয়! হাঁহাঁ সর্দারের জয়! তারপর তেমনি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হাঁহাঁকে বেষ্টন করে সবাই মণ্ডলাকারে তাণ্ডব-নৃত্য করতে লাগল, বিপুল উল্লাসে!

সেই আদিম যুগের আদিম মানুষদের আদিম আনন্দের নৃত্যছন্দ আজকের আমাদের বুকে আর বাজে না, সুতরাং তার গভীরতাও আমরা আর বুঝতে পারব না।

সেই উচ্ছসিত আনন্দের শিহরণ গিয়ে লাগল গহণ-বনের গাছে গাছে পাতায় পাতায় এবং সেই আনন্দের অনাহত ভাষা মুখে নিয়ে আদিম প্রতিধ্বনি কৌতুকলীলায় ছুটে গেল পাহাড়ের শিখরে শিখরে, দূরে দূরান্তরে!

পশ্চিম আকাশের রঙিন প্রাসাদের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আলোক-সম্রাট সূর্যদেব। সন্ধ্যা আসন্ন। এখনই জাগবে অন্ধকার এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগবে তার শত শত অনুচর—শত শত বিভীষিকা, শরীরী দুঃস্বপ্ন!

কিন্তু ওদের নাচ তবু থামল না, তার মত্ততা ক্রমে ক্রমে আরও বেড়ে উঠল!

আজ আর অন্ধকার ও বনবাসী শত্রুর ভয় নেই। মানুষ যে বিশ্বজয়ের প্রধান অস্ত্র অগ্নিকে লাভ করেছে! হে হে! চালাও নাচ! জোরে চালাও—আরও, আরও দুন-তালে!

বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো

হাঁহাঁদের পাহাড় থেকে মাইল-খানেক তফাতে আর-একটা ছোটো পাহাড়, তারই উপরে দুটো বড়ো বড়ো গুহার মধ্যে হুঁহুঁদের আস্তানা।

সেই পাহাড়ের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে বাঘবন! দুর্গম ও নির্জন বন, কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবজন্তুর পক্ষেই ভয়াবহ। সে বনের ভিতরে অন্য কোনও জীব ঢোকে না, এবং আলোও ঢোকবার পথ খুঁজে পায় না। আমাদের সেই মধুলোভী গুহাভালুকি একবার সেই বনে মৌচাক খুঁজতে গিয়ে বাঘের এমন বিষম চড় খেয়ে পালিয়ে এসেছিল যে, আর কোনও দিন ওমুখে হবার ভরসা করেনি!

আলোর অভাবে বাঘবনের ভিতরে সর্বদাই বিরাজ করে সন্ধ্যার কালো ছায়া। দেহে লতা- গুল্মের জাল জড়িয়ে অনেক বড়ো-বড়ো বনস্পতি আকাশ-ছোঁয়া ঝাঁকড়া মাথাগুলো শূন্যে দুলিয়ে মর্মর-চিৎকারে সবাইকে যেন সর্বদাই সাবধান করে দিচ্ছে—সাবধান, সাবধান! এ বনে ভুলেও কেউ এসো না!

সেখানকার চিরস্থায়ী কালো ছায়ার উপরে ভীষণা রাত্রি এসে যখন আরও-পুরু কালিমা মাখিয়ে দেয়, বিশ্বব্যাপী নিশীথিনীর লক্ষ লক্ষ জোনাকি-চক্ষুগুলো যখন পিট-পিট করতে থাকে অশ্রান্তভাবে, বাঘবনের ঝোপে ঝোপে জাগে তখন শুকনো পাতার উপরে অদৃশ্য মৃত্যুর পদধ্বনি এবং হিংস্র, রক্তলোভী কণ্ঠের গভীর গর্জনের পর গর্জন।

আমরা একেলে বাঘ দেখি, আর তাকেই ভয় করি যমের মতো! কিন্তু তাদের যেসব পূর্বপুরুষ এই বাঘবনের ছায়ায় ও অন্ধকারে বিচরণ করত, তারা যে কেবল আকারেই আরও বড়ো ছিল তা নয়, চেহারায় ও স্বভাবেও ছিল আরও ভয়ঙ্কর! সবচেয়ে করাল ছিল তাদের চোয়ালের দুই পাশে ঝুলে-পড়া বাঁকা তলোয়ারের মতো দুটো সুদীর্ঘ দন্ত! তারা মুখ বন্ধ করলেও দাঁত দুটো হাতির

দাঁতের মতো বাইরে বেরিয়েই থাকত। এই জন্যেই তাদের খাঁড়াদেঁতো বাঘ বলে ডাকা হয়। আধুনিক মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, খাঁড়াদেঁতোদের বংশ লোপ পেয়েছে অনেককাল আগেই। নইলে কেবল মানুষ প্রভৃতি জীব নয়, আজকের সুন্দরবনের প্রসদ্ধ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ও আফ্রিকার বিখ্যাত সিংহ পর্যন্ত খাঁড়াদেঁতোদের জলখাবারে পরিণত হত।

খাঁড়াদেঁতোদের ভয়ে বাঘবন থেকে অতিকায় ম্যামথহাতিরাও দল বেঁধে সরে পড়েছিল। বাঘবনে বাস করত কেবল হায়না প্রভৃতি দু-চারটে ছোটো ছোটো জীব, খুব-সাবধানী ও অতি দ্রুতগামী বলে খাঁড়াদেঁতোদের দন্ত-নখরকে ফাঁকি দিয়ে তারা নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে পারত। বাঘবনে রাজার মতো ছিল একটা বাঘ, হুঁহুঁ যার নাম রেখেছিল বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো। অন্যান্য বাঘরা নিজেদের বন ছেড়ে রোজ রাতে বেরিয়ে নানা দিকে যেত, নানা জীব শিকার করবার জন্যে। কিন্তু ওই বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোর ভারী শখের খাবার ছিল, মানুষ। সে প্রায়ই এসে হানা দিত হুঁহুদের আস্তানায়, আর বাগে পেলে প্রায়ই এক-একজন মানুষকে ধরে মুখে তুলে নিয়ে ফিরে যেত নিজের আড্ডায়। হুঁহুঁ আগে অনেক লোকের উপরে সর্দারি করত, কিন্তু খাঁড়াদেঁতোর শখ মিটিয়ে মিটিয়ে তার দল এখন যথেষ্ট হালকা হয়ে পড়েছে। তাদের চকমকিপাথরের বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ওই বুড়োকে মোটেই ব্যতিব্যস্ত করতে পারত না, কারণ একে সে এত চটপটে যে কেউ অস্ত্র তোলবার সময় পর্যন্ত পেত না, তার উপরে পাথরের বর্শার পক্ষে বুড়োর চামড়া ছিল যথেষ্ট পুরু। তবে হ্যাঁ, একবার গুঁগুঁর ছেলে ঢুঁঢুঁ এমন একটা মস্ত পাথর তার হেঁড়ে মাথায় ধাড়াস করে ছুড়ে মেরেছিল, যার ফলে বুড়োকে বেশকিছুদিন ভুগতে হয়েছিল দারুণ মাথা-ধরা রোগে।

সেই সময়ে তার সুয়োরানি বাঘ-বউ (বুড়োর দুই বিয়ে কিনা) বলেছিল, 'ওগো কর্তা, বুডড়ো বয়সে রোগে ধরল, এখন কাচ্চা-বাচ্চাদের মানুষ করি কী করে বলো দেখি?

বুড়ো রেগে কটমটিয়ে তাকিয়ে খাড়াদাঁত উঁচিয়ে বললে, হালুম! কে বলে রে আমি বুড়ো? পাজি মানুষ-জন্তুগুলো আমাকে বুড়ো বলে ডাকে বলে তুই বুড়িও আমাকে বুড়ো বলে ডাকতে চাস নাকি? আমার মতন জোয়ান এ-তল্লাটে কে আছে রে?

চালাক দুয়োরানি বাঘ-বউ তাড়াতাড়ি এগিয়ে বুড়োর গায়ে গা ঘষতে ঘষতে আদরমাখানো স্বরে বললে, হুম-হুম ঘ্যাক-ঘ্যাক গোঁ-গোঁ-গাঁ-গাঁ! অর্থাৎ— কে বলে গা তোমাকে বুড়ো! বড়ো গিন্নি যেন কী! কিন্তু তোমার মাথাটা অমন ফুলল কেন কর্তা?

বুড়ো বললে, মাথা ধরলেই মাথা ফোলে! তুচ্ছ মানুষের হাতে মার খেয়ে যে মাথার অমন দুরবস্থা, এ-কথাটা চেপে গেল।

কিন্তু সেইদিন থেকে বুড়ো হল আরও বেশি সাবধান। এমন চুপিসাড়ে সে মানুষ চুরি করে যে, হুঁহুঁর দল তার টিকি পর্যন্ত দেখতে পায় না। (তোমার হয়তো ভাবছ, বাঘের আবার টিকি কী? কিন্তু বাঘের টিকি হচ্ছে, ল্যাজ। বিশেষত সেকালের খাঁড়াদেঁতোদের ল্যাজ ছিল এত খাটো যে, টিকি ছাড়া অন্য কোনও নামে তাকে না ডাকাই উচিত।)

হুঁহুঁ এই বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোকে চিট করবার জন্যেই হাঁহাঁর কাছে ধরনা দিয়ে পড়েছে। কিন্তু হাঁহাঁর কিঞ্চিৎ অসুবিধা হচ্ছে। সে বিলক্ষণ জানে, একমাত্র অগ্নিদেবের মহিমাই তার মান-সম্ভ্রম বাড়িয়ে তুলেছে এতখানি। এরা বশ মেনেছে ভালোবেসে নয়, ভয়ে। এই ভয় যেদিন দূর হবে, এরা তাকে কীটপতঙ্গের মতো টিপে মেরে ফেলতে ইতস্তত করবে না।

সুতরাং এদের এই ভয়কে জাগিয়ে রাখা দরকার অষ্টপ্রহর। তাকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে, হুঁহুঁরা যাতে কিছুতেই আগুন সৃষ্টি করবার গুপ্তরহস্য জানতে না পারে।

আসল গুপ্তকথা হাঁহাঁ কারুকে বলেনি—ছেলেদেরও না, বউকেও না। সে যে শুকনো পাতার গাদায় ডালে ডালে ঘষে আগুন তৈরি করে, তার পরিবারবর্গ বড়ো-জোর এইটুকুই দেখেছে। কিন্তু বিশেষ একজাতের গাছের ডাল না হলে যে অগ্নি উৎপাদন করা অসম্ভব, এটুকু বুদ্ধি নেই তাদের কারুর ঘটেই, তারা অবাক হয়ে ভাবে, এসব ফুসমন্তরের লীলাখেলা!

হাঁহাঁও সব কথা চেপে গিয়েছে চালাকের মতো। প্রতিজ্ঞা করেছে, আসল ব্যাপার কারুর কাছেই ভাঙবে না। যতদিন সবাই থাকবে অন্ধকারে, ততদিনই তার জয়-জয়কার!

কিন্তু সকলের সঙ্গে বাঘবনে গিয়ে প্রকাশ্যে আগুন জ্বালবে সে কেমন করে? সেইটেই হয়েছে তখন তার সমস্যা!

অবশেষে ভেবে ভেবে একটা উপায় বার করলে। ছেলেদের ডেকে বললে, ওরে টুটু, ওরে ঘটু! বাঘবনে তোরা আমার সঙ্গে যাবি রে! শোন, কেমন করে আমার কাছে খোকা আগুন আসে, সে কথা কারুকে বলিসনে!

তারা বললে, বলব না রে বাপ! অবশ্য বললেও খুব বেশি ক্ষতি ছিল না। কারণ টুটু-ঘটু তো জানে না, তাদের বাপের হাতের ডালদুটো কোন গাছের! এমনকী তারা নিজেরাও যা তা গাছের ডাল নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছে, আগুন জ্বলে না!

তবু হাঁহাঁ সব ব্যাপারটাই রহস্যের মতো রাখতে চায়। কারণ সাবধানের মার নেই। পরদিন দুপুরেই হুঁহুঁ আর টুঁটুঁ তাদের দলবল নিয়ে এসে হাজির। হুঁহুঁ এগিয়ে এসে হাঁহাঁর সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, চল রে সর্দার! বাঘবন জয় করবি চল!

হাঁহাঁ তার বর্শাটা মাটিতে ঠুকে সদম্ভে বললে, যাবই তো! বাঘবন জয় করে পুরিয়ে ছারখার করে দিয়ে আসব রে!

—বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো ভারী ধড়িবাজ! মানুষ দেখলেই ঘাড়ে ঝাঁপ খায়!

—রাখ রে রাখ! বুড়ো ঝাঁপ খায় তোদের ঘাড়ে! তাকে দেখলে আমারই ফুস-মন্তর ঝাঁপ খাবে তার ঘাড়ে। চল দেখবি চল!

দেবতার পানে লোকে যেমনভাবে তাকায়, হাঁহাঁর গর্বিত মুখের দিকে সদলবলে হুঁহুঁ তাকিয়ে রইল তেমনি ভক্তিভরে—না, শুধু ভক্তি নয় তার মধ্যে ভয়ের ভাবও ছিল বইকী!

চলল সবাই বাঘবনের দিকে। যেপথ ধরে তারা অগ্রসর হল তোমরা যদি সেখানে থাকতে, তাহলে নিশ্চয়ই বলতে, 'আহা, আহা, কী চমৎকার!

সত্যি, চমৎকারই বটে। অতুল! সেকালকার জীবজন্তুদের চেয়ে একালের জীবজন্তুদের আকৃতি প্রকৃতি হয়তো উন্নত হয়েছে, কিন্তু তখনকার নিসর্গ-দৃশ্য এখনকার তুলনায় শ্রেষ্ঠতার দাবি করতে পারে নিশ্চয়ই! আকাশের নিবিড় নীলিমাকে তখন শহর আর কলকারখানার কালো ধোঁয়া ময়লা করে দিতে পারত না, নদীর বুকে ছুটত না তখন কর্কশ পোঁ বাজিয়ে বিশ্রী ইস্টিমার এবং ঘনশ্যামল খেতের বুক চিরে ভীষণ চিৎকারে কান ফাটিয়ে ও বিষম শব্দে মাটির প্রাণ কাঁপিয়ে ধেয়ে চলত না ভয়াবহ লৌহ-অজগরের মতো সুদীর্ঘ রেলের গাড়ি!

চারিদিকে সুন্দর শান্তির রাজ্য! সোনা রোদের আলোয় নীলাম্বর করেছে ঝলমল-ঝলমল এবং গাঢ়-সবুজ বনে বনে ফলফুল লতাপাতার সভায় গিয়ে আলো আর ছায়ায় মিলে খেলছে মনোরম ঝিলমিল-ঝিলমিল খেলা! কোথাও মেঘের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে বিপুল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিরাট পর্বত এবং তার কালো বুকে দুলছে কলকৌতুকহাসিতে ভরা ঝরনার রুপোলি হার, কোথাও ঘাসের সবুজ সাটিনে নরম বিছানা পেতেও ঘুমোতে না চেয়ে ছুটে চলেছে দুই নদী-মেয়ে কুলকুল গান গেয়ে! হরিণ চরছে, পাখি ডাকছে, নামহীন ফুলেরা মৌমাছি-প্রজাপতিদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে মন-মাতানো গন্ধদূতদের!

কিন্তু হাঁহাঁ ও হুঁহুঁ প্রভৃতি সেকালকার আদি মানুষরা এসবের মাধুর্য নিজেদের অজান্তেই প্রাণে-প্রাণে অনুভব করলেও, এদের সৌন্দর্য নিয়ে হয়তো

আজকালকার কবিদের মতো ভাষায় আলোচনা করতে শেখেনি। শিখলেও সে আলোচনার সময় সেদিন ছিল না।

কারণ পথ চলতে চলতে টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ সেদিন কেবলই ভাবছে, হাঁহাঁ-সর্দারের ফুস-মন্তর যদি ফসকে যায়, বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো তাহলে আগে তার দিকেই নজর দেবে, না, আগে আমাকেই গপ করে গিলে ফেলতে আসবে?

আর হাঁহাঁ ভাবছে ক্রমাগত, বাঘবনে বাঘ আছে অগুনতি, একা খোকা-আগুন যদি তাদের সবাইকে সামলাতে না পারে, তাহলে ফিরে এসে আর সর্দারি করতে পারব কি?

আরও খানিকটা এগিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে হুঁহুঁ বললে, ওই দেখ রে সর্দার, ওই বাঘবন!

হাঁহাঁ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, পাশের একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, খবরদার, তোরা কেউ আমার সঙ্গে আসিসনে!

—কেন সর্দার?

—আমি ফুসমন্তর ঝাড়তে যাচ্ছি।

—তা আমরা যাব না কেন?

—আমি এখন মন্তর পড়ে অগ্নিদেবকে ডাকব। সে-সময়ে অন্য কেউ কাছে থাকলে দেবতার কোপে মারা পড়বে!

এমন বিষম যুক্তির উপরে কথা চলে না। হুঁহুঁ তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল!..

হাঁহাঁ সেই যে বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল, আর বেরুবার নাম নেই। এই আসে এই আসে করে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁহুঁদের পা করতে লাগল টন টন।

হুঁহুঁ শেষটা হাঁড়িপানা মুখ করে টুটুকে ডেকে বললে, এই! তোর বাপটা লম্বা দিলে নাকি?

টুটু বুক ফুলিয়ে বললে, কী যে বলিস টুঁটুঁর বাপ! তোদের মতো আমাদের বাপ পালায় না রে!

—তবে সে গেল কোথা?

—বাবা ফুসমন্তর আউড়ে পুজো করছে!

—ছাই করছে!

হঠাৎ টুঁটুঁ উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, বাবা!

—কী রে, কী রে?

—অগ্নিদেব! টুঁটুঁ জঙ্গলের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

হুঁহুঁ চমৎকৃত হয়ে দেখলে, জঙ্গলের উপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং ভিতরে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দাউ-দাউ আগুন!

সে সভয়ে অথচ সানন্দে চেঁচিয়ে বললে, জয় অগ্নিদেব! জয় অগ্নিদেব! জয় অগ্নিদেব!

তারপরেই দেখা গেল, জঙ্গলের ভিতর থেকে সদর্পে পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসছে হাসিমুখে হাঁহাঁ-সর্দার, তার দুই হাতে দুইখানা জ্বলন্ত কাঠ!

হাঁহাঁ কাছে এসেই বললে, যা রে তোরা সবাই, ওই জঙ্গলে যা! ওখানে এমনি আগুনকাঠ আরও অনেক আছে, তোরা সবাই-দুখানা করে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে বাঘবনে ছুটে চল! যা, যা, দেরি করিসনে, অগ্নিদেব তাহলে পালিয়ে যাবেন!

হাঁহাঁর ফুস-মন্তরের প্রভাব দেখে টুটু-ঘটু ছাড়া বাকি সকলেই বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিদেবের পালাবার সম্ভাবনা আছে শুনে তাদের চমক ভাঙল এবং সবাই একছুটে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দুয়োরানি বাঘ-বউয়ের দুই খোকা আর এক খুকি হয়েছিল, সে তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। খুকিকে দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরে গা চেটে দিচ্ছে এবং টিকির মতো ছোট্ট ল্যাজটা নেড়ে নেড়ে খোকাবাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেলা করছে।

সুয়োরানি প্রতিদিন যা করে, সেদিনও তাই করছিল, অর্থাৎ বরের সঙ্গে ঝগড়া।

—দুদিন আজ শিকারে যাওনি, সংসারে যে খাবার বাড়ন্ত সে হুঁস আছে?

ছায়া যেখানে প্রায় অন্ধকারেরই মতো ঘন, সেইখানে একরাশ শুকনো পাতার বিছানায় কুঁকড়েসুকড়ে পরম আরামে শুয়ে বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো একটি দীর্ঘ নিদ্রা দেবার আয়োজন করছিল। সেই অবস্থাতেই অস্পষ্ট স্বরে সে বললে, ঘ্যানর ঘ্যানর করিসনে বলছি! কেন থাবা খেয়ে মরবি? দুয়োরানি খুকির গা-চাটা থামিয়ে স্বামীর পক্ষ নিয়ে বলল, খিদে যদি পেয়ে থাকে দিদি, নিজেই গিয়ে পাহাড় থেকে একটা মানুষ ধরে নিয়ে এসো না! কর্তাকে আর জ্বালাও কেন? বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো হঠাৎ মাথাটা একটু তুলে বললে, ছোটোগিন্নি, তুই মানুষের নাম করতেই নাকে যেন মানুষের গন্ধ পাই!

সুয়োরানি খাঁড়াদাঁত খিঁচিয়ে বলেলে, বুড়োর ভমিরতি হয়েছে! বাঘবনে মানুষের গন্ধ! কী যে বলে!

সে কথা কানে না তুলে বুড়ো তাড়াতাড়ি চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, বনের ওখানটা নড়ছে কেন?

সুয়োরানি চটপট বরের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, শুকনো পাতার ওপরে খড়-মড় শব্দ হচ্ছে কেন?

দুয়োরানি চটপট স্বামীর আর এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, বনের ভেতর ধোঁয়া উঠছে কেন?

বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো হা হা হা হা করে হেসে উঠে বললে, দেখতে পেয়েছি। বড়ো গিন্নির ভারী বরাত-জোর, বাঘবনে খাবার নিজেই এসে হাজির হয়েছে! আরে, আরে, একটা নয়— দুটো নয়, অনেকগুলো খাবার যে! হাঁউ-মাউ-খাঁউ! ভীষণ গর্জনে বাঘবনের গাছ-পাতা কাঁপিয়ে সে প্রকাণ্ড এক লম্ফত্যাগ করলে!

প্রথম লাফের পর দ্বিতীয় লাফ, তারপর সে যখন তৃতীয় লাফ মারবার উপক্রম করছে, জঙ্গল ভেদ করে হল হাঁহাঁর আবির্ভাব এবং পরমুহূর্তেই সে বুড়োকে একে একে দুখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুড়ে মারলে!

বুড়ো চট করে সরে প্রথম কাঠখানা এড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় কাঠখানা ফটাং করে তার পিঠের উপরে এসে পড়ল বটে, কিন্তু তার গতি রোধ করতে পারলে না, অগ্নিদাহের যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে মহাক্রোধে সে তৃতীয় লাফ মেরে একেবারে হাঁহাঁর সামনে গিয়ে পড়ে তুললে তার প্রচণ্ড থাবা!

হাঁহাঁর সর্দারি সেইখানেই ফুরিয়ে যেত, কিন্তু চকিতে হুঁহুঁর বেটা ঢুঁঢুঁ পিছনে থেকে সুমখে এসে, বুড়োর মুখের উপরে ভয়ানক জোরে বসিয়ে দিলে জ্বলন্ত কাঠের আর এক ঘা— আবার এক ঘা!

অসহ যাতনায় পাগলের মতো বুড়ে চারিদিকে ছুটোছুটি করে গাঁ-গাঁ রবে, আর থেকে থেকে নিজের মুখ-চোখের উপরে দুই থাবা ঘষে। তার এলোমেলো দৌড় দেখে কারুরই আর বুঝতে বাকি রইল না যে, ঢুঁঢুঁর কাঠের আগুনে পুড়ে খাঁড়াদেঁতোর দুই চক্ষুই হয়েছে অন্ধ! তখন চারিদিক থেকে তার উপরে জ্বলন্ত কাঠি বৃষ্টি হতে লাগল—সেই সঙ্গে বড়ো বড়ো পাথরও! দেখতে দেখতে তার ছটফটানি স্থির হয়ে এল এবং ক্ষীণ হয়ে এল তার গর্জন ও আর্তনাদ। তারপর খাঁড়াদেঁতোর দেহ একেবারে নিশ্চেষ্ট।

সুয়োরানি ও দুয়োরানি প্রভৃতি এই কল্পনাতীত অগ্নিকাণ্ড দেখে ভড়কে গিয়ে, অনেকক্ষণ আগেই টিকির মতো ছোটো ল্যাজ তুলে দিয়েছে লম্বা ভোঁ-দৌড়!

হুঁহুঁ আহলাদে আটখানা হয়ে হাঁহাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে বললে, ওরে আমাদের হাঁহাঁ-সর্দার! তোকে আমরা পুজো করব রে!

হাঁহাঁ বললে, আরে ছাড় ছাড়, এখনও আমার কাজ বাকি আছে!

হাঁহাঁকে নামিয়ে দিয়ে হুঁহুঁ বললে, বুড়ো তো অক্কা পেয়েছে রে, আবার কী কাজ বাকি?

—বুড়ো মরেছে বটে, কিন্তু বাঘবনে কি আর বাঘ নেই?

হুঁহুঁ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, তা আছে বইকী?

—আজ তাদের সবাইকে হয় মারব, নয় তাড়াব!

—দূর সর্দার, অসম্ভব!

—অগ্নিদেবতার দয়া হলে কিছুই অসম্ভব নয়!...ভাইসব, বনের তলটা শুকনো পাতায় ছেয়ে আছে, কাঠের আগুনে ধরিয়ে দে পাতাগুলো!

হাঁহাঁর ফন্দি ব্যর্থ হল না! ঘণ্টা চার পরে দেখা গেল, বাঘবনের মধ্যে বহুদূরব্যাপী দাবানলের তাণ্ডব-নাচ শুরু হয়েছে এবং তার লক্ষ লক্ষ লকলকে রক্তশিখা যেন মহাক্ষুধায় অস্থির হয়ে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে চিৎকার করতে করতে!

এবং বনের মধ্যে সর্বত্র জেগে উঠেছে খড়্গদন্ত ব্যাঘ্রদের আর্তধ্বনি! আগুনের বেড়াজালে ধরা পড়ে কত বাঘ যে মাটিতে আছড়ে-পিছড়ে মারা পড়ল তার আর সংখ্যা নেই। বাকি বাঘগুলো সে বন ছেড়ে কোথায় সরে পড়ল, তা কেউ বলতে পারে না! তখন থেকে ব্যাঘ্রবনে হল ব্যাঘ্রেরর অভাব। মানুষরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

হাঁহাঁ একগাল হেসে বললে, কী রে হুঁহুঁ! আমার বাহাদুরিটা দেখলি তো!

হুঁহুঁ কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, কী আর বলব সর্দার! দে, তোর পায়ের ধুলো নিই!

হুঁহুঁর দলবল একসঙ্গে চিৎকার করে বললে, জয়, জয় হাঁহাঁ-সর্দারের জয়!

হাঁহাঁ নিজের নামে জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ কী ভাবলে। তারপর ফিরে ডাকলে, ঢুঁঢুঁ।'

—সর্দার!

—আজ তুই না থাকলে আমি মারা পড়তুম। না রে?

ঢুঁঢুঁ চুপ করে রইল।

—শাবাশ জোয়ান তুই।

—সর্দার, আমি তোর ছেলের মতো।

—তুই আমার নিনিকে বিয়ে করতে চাস?

টুঁটুঁ ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। গুরুজনদের সামনে সেকালের বর বা বউ কারুরই সঙ্কোচ ছিল না।

—শোন হুঁহুঁ! তোর বেটা আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তাই নিনিকে আমি তার হাতে দেব। আজ রাতেই এদের বিয়ে হবে।

আজ রাতে? অন্ধকারে?

—দূর বোকা! আমার ঘরে আছেন যে অগ্নিদেব! গুহাভালুক আর খাঁড়াদেঁতোর মতো অন্ধকারকেও আমি যে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি! নে, এখন চল! বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোর লাশটাকেও নিয়ে চল, বিয়ের ভোজে কাজে লাগবে!

—ঠিক বলেছিস সর্দার! খাঁড়াদেঁতো রোজ আমাদের খেত, আজ আমরা ওকেই খাব। ওহে, কী মজা!

বাঘবনের বিরাট অগ্নি-উৎসবের লাল আভায় রঞ্জিত পথ দিয়ে সকলে হাসিমুখে ফিরল, বিয়ের ভোজের কথা ভাবতে ভাবতে!

আদিম মানুষদের কথা

মানুষের পুরানো কাহিনি বলতে বলতে এইবারে গল্প থামিয়ে ছোট্ট একটি আলোচনা করব। তোমরা হয়তো ভাবছ, এতক্ষণ ধরে মানুষের যে ইতিহাস বললুম তা কাল্পনিক কথা। মোটেই নয়। নৃতত্ত্ববিদ অর্থাৎ নরবিদ্যায় যারা পণ্ডিত, তারা ঠিক সুচতুর ডিটেকটিভের মতোই নানা প্রমাণ দেখে মানুষের সত্যিকার ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। এসব বিষয় নিয়ে আজীবন নাড়াচাড়া করে তারা এতটা পাকা হয়ে উঠেছেন যে, প্রাচীন মানুষদের মাথার খুলির বা চোয়ালের ভগ্নাংশ দেখেই বলে দিতে পারেন, সম্পূর্ণ অবস্থায় তাদের মুখের গড়ন ছিল কীরকম। তাদের আচার-ব্যবহারও নানা উপায়ে জানা গিয়েছে। একটা উপায়ের কথা বলছি। ধরো, আদিম মানুষদের দ্বারা ব্যবহৃত একটা গুহা আবিষ্কৃত হল। সে গুহায় ঢুকে প্রথমটা কিছুই হয়তো দেখা যাবে না; কারণ দশ-পনেরো-বিশ হাজার বৎসরের পুঞ্জীভূত ধুলা-জঞ্জাল কঠিন মাটিতে পরিণত হয়ে গুহার ভিতরকার সমস্ত দ্রষ্টব্যকেই কবর দিয়েছে। পণ্ডিতরা তখন গুহার মেঝে খুঁড়তে আরম্ভ করলেন। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল মানুষের খুলি বা কঙ্কালের সঙ্গে ম্যামথ হাতির দাঁত। কঙ্কালাবশেষ এবং বল্লা হরিণ (rein deer), রোমশ গণ্ডার, ভাল্লুক ও ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুর হাড়, চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য জিনিস।

পণ্ডিতরা মানুষের খুলি বা কঙ্কালের কাঠামোর উপরে প্লাস্টার চাপিয়ে আগে তার চেহারা আবিষ্কার করলেন। তারপর চিন্তা করে বুঝলেন, ওইসব অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্তর তারা ব্যবহার করত এবং যেসব জন্তুর মাংস তারা ভক্ষণ করত ওই হাড়গুলো তাদেরই। মাংস খাবার পর হাড়গুলো তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। হাড়গুলো দেখে আরও বোঝা গেল, ওই জাতের মানুষদের যুগে কোন কোন জীব পৃথিবীতে বিচরণ করত।

নর-বিদ্যায় এখনকার সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিত Sir Arthur Keith বলেন, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে বানর। কিন্তু অন্যান্য অনেক পণ্ডিতের মতে, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে এমন কোনও জীব, যে ঠিক বানরও নয়, ঠিক মানুষও নয়। কিন্তু সে যে কীরকম জীব তা কেউ জানে না, কারণ তার কোনও কঙ্কাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস লেখা আছে পৃথিবীর বুকের ভিতরেই। আজ পর্যন্ত যত জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জন্মে আবার চিরবিদায় নিয়েছে, পৃথিবীর মাটির স্তরে স্তরে তাদের অধিকাংশেরই চিহ্ন লুকোনো আছে। এক-একটি বিশেষ স্তরে পাওয়া যায় এক-একটি বিশেষ জাতের জীবজন্তু বা উদ্ভিদের চিহ্ন। সকলের আগে যারা জীবজগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া যায় তাদের চিহ্ন। এইরকম এক-একটি স্তরকে এক-একটি বিশেষ যুগ বলে ধরা হয়। এক-একটি স্তর পড়তে কত কাল লাগে, ভূতত্ত্ববিদরা তারও একটা মোটামুটি হিসাব করে ফেলেছেন। এই হিসাবের ওপর নির্ভর করেই বলা হয়, কত হাজার বৎসর আগে পৃথিবীতে এক সময়ে ছিল তুষারযুগ। খুব সম্ভব সেই সময়েই হয় প্রথম মানুষের আবির্ভাব। মানুষের সবচেয়ে-পুরানো কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ যবদ্বীপে বা জাভায়। কঙ্কাল পরীক্ষা করবার পর তার আকৃতি-প্রকৃতির অনেক কথাই জানা গিয়েছে। তাকে বানর-মানুষ বলে ডাকা হয়। তার মাথার খুলির গড়ন গিবন-বানরের মতো। কিন্তু সে মানুষের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটত, ছুটত এবং মুঠোয় লাঠি ধরতে পারত, তবে কাপড়চোপড় পরত না। খুব সম্ভব, সে কথাবার্তা কইতেও জানত না। আর তার মস্তিষ্কের শক্তি বনমানুষের তুলনায় উন্নত হলেও আধুনিক মানুষের তুলনায় বিশেষ উন্নত ছিল না। পণ্ডিতদের মতে, এই সময়েই অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে ভয়াবহ খাঁড়াদেঁতো বাঘরা ছিল মানুষের সহচর। আমরা যে-যুগে খাঁড়াদেঁতোদের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ দেখিয়েছি, সেযুগে হয়তো তাদের অস্তিত্ব ছিল না। তবে

কোনও একটা জন্তু একযুগেই নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। খাঁড়াদেঁতোদের শেষ বংশধররা দলে হালকা হলেও পরবর্তী যুগেও যে পৃথিবীর দু-এক জায়গায় বিচরণ করত না, একথা কে জোর করে বলতে পারে? যেমন ভারতীয় সিংহদের যুগ আর নেই, তবু তাদের কয়েকটি জীবন্ত নমুনা আজও দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান।

সেই নির্দয় তুষারযুগে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে, উত্তর আফ্রিকায় ও উত্তর ভারতে যে মানুষের অস্তিত্ব ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকের মতে, মানুষের প্রথম জন্ম হয় মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতরা বলেন, আদিম যুগেও জায়গার উপরে প্রকৃতির দৃষ্টি ছিল এমন কঠোর যে, মানুষ সেখানে টিকতেই পারত না। এদের মতে উত্তর আফ্রিকা থেকে পারস্যের মধ্যবর্তী কোনও স্থান মানুষের আদি জন্মভূমি।

মানুষের আদি জন্মভূমি যেখানেই হোক, আদিম মানুষদের আত্মরক্ষার জন্যে যে কঠিন জীবন যুদ্ধে নিযুক্ত হতে হয়েছিল, আজকের আমাদের কাছে তা অমানুষিক বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। ভীষণ ভীষণ জানোয়ারের ও তুষারযুগের কল্পনাতীত শীতের সঙ্গে দুর্বল বানরমানুষরা অবিরাম যুদ্ধ করেছে—দেহ তাদের ক্ষুদ্র ও নগ্ন এবং তারা অগ্নির ব্যবহারও জানত না! আর পাথরের অস্ত্র পর্যন্ত তখনও তৈরি করতে শেখেনি!

তখনকার শীত এমন ভয়ানক ছিল যে, বহু অতিকায় ও মহাবলিষ্ঠ জীবও তা সহ্য করতে পারেনি বলে তাদের বংশ একেবারে লোপ পেয়েছে। কিন্তু সেই তুষারমরু পার হয়ে ক্ষুদ্র হয়েও মানুষ বর্তমানের দিকে বিজয়ীর বেশে এগিয়ে আসতে পেরেছে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের জোরে। এই মস্তিষ্কেরই অভাবে মানুষের আগে আর কোনও জীব বস্ত্র ও অগ্নি ব্যবহার করতে শেখেনি। বানর-মানুষদের পরে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে বিচরণ করেছে, তাদের Peking. Rhodesian, Piltdown, Heidelberg, Pre-Chellean ও Chellean মানুষ

প্রভৃতি বলে ডাকা হয়। এরই মধ্যে খুব সম্ভব আরও নানা জাতের মানুষ পৃথিবীতে এসে স্বজাতিকে ক্রমোন্নতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু এখনও তাদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়নি।

পূর্বোক্ত Keith সাহেবের মত হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়, আনুমানিক দশ লক্ষ বৎসর আগে। কিন্তু নিশ্চয়ই প্রথম যুগে এবং তারও কয়েক লক্ষ বৎসর পরেও মানুষ ছিল বানরের নামান্তর মাত্র। কারণ জাভায় প্রাপ্ত মানুষের কঙ্কালাবশেষের বয়স হচ্ছে পাঁচ লক্ষ বৎসর, অথচ তখনও সে বানরের চেয়ে বিশেষ উন্নত হতে পারেনি। পিকিং মানুষের বয়স ধরা হয়েছে আড়াই লক্ষ বৎসর,---Rhodesian মানুষেদেরও ওই বয়স। Heidelberg মানুষরা দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত। কিন্তু এদেরও মস্তিষ্ক অপরিণত। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মানুষের মস্তিষ্ক বর্তমান আকার লাভ করেছে কল্পনাতীত কত যুগব্যাপী চর্চার পর।

তারপর নিয়ানডের্টাল মানুষের আগমন— এতক্ষণ ধরে যাদের গল্প তোমাদের কাছে বলেছি। ওই নিয়ানডেটার্লদের দেহাবশেষ ইউরোপেই পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু ও-জাতের বা ওদের মতন মানুষ যে তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। কেউ কেউ হিসাব করে বলেছেন, নিয়ানডেটার্লরা পৃথিবীতে এসেছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে। এদের যুগের চিরস্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে মানুষের অগ্নিলাভ। এই এক আবিষ্কারই মানুষ যে কী করে অপরাজেয় ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠল, গল্পের মধ্যেই তার অল্পবিস্তর আভাস তোমরা পেয়েছ।

আমরা যে সময়ে হাঁহাঁর অগ্নিলাভ করার কথা উল্লেখ করেছি, অন্যান্য জায়গাকার মানুষদের সঙ্গে অগ্নির বন্ধুত্ব হয়েছে, তার ঢের আগেই। কিন্তু এতে আমাদের ভুল হয়নি। কারণ আদিমকালে নানা দেশের মানুষদের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়েই আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল না। কাজেই অগ্নি ব্যবহার করতে

শিখেছে কোনও দেশের মানুষ অনেক আগে, কোনও দেশের মানুষ অনেক পরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কোনও কোনও আদিম জাতি আজও আগুন জ্বালাতে জানে না!

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে, নিয়ানডের্টালরাও দেহেও এমন সব লক্ষণ ছিল, যা বানর বা বনমানুষদের দেহেই দেখা যায়।

আনুমানিক পনেরো হাজার বছর আগে থেকে নিয়ানডেটার্ল'রা বিলুপ্ত হতে শুরু করে। তারা একেবারে লুপ্ত হবার আগে আবার যেসব নতুন জাতির আবির্ভাব হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত হচ্ছে ক্রো-ম্যাগনন মানুষরা। এদেরই আধুনিক মানুষ বলে ডাকা হয় এবং কোন দেশে এদের প্রথম জন্ম বা আবির্ভাব তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে ইউরোপে গিয়েছিল তারা বোধহয় উত্তরআফ্রিকা থেকে। তাদের মুখে-চোখে ছিল কিছু কিছু মঙ্গোলীয় ও আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ান ছাপ।

আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি, এই রকম আধুনিক মানুষরা ভারতবর্ষেও আবির্ভূত হয়েছিল, কেননা ভারতীয় সভ্যতার বয়স ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি। পরের পরিচ্ছেদে এই নতুন আধুনিক মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারের কথা তোমরা জানতে পারবে।

নতুন মানুষ

ভারী চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে! শখ করে বেড়াতে বেরিয়েছে নতুন বর ঢুঁঢুঁর সঙ্গে নতুন বউ নিনি।

সেদিনও কোকিল ডাকত, শ্যামলতার অন্তঃপুর থেকে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ভাষা অনেক বদলেছে, কিন্তু কোকিলের ভাষা ছিল ওই একই রকম। অর্থাৎ—কুহু কুহু কুহু!

কোকিলের গান শুনতে শুনতে তারা নদীর ধারে গিয়ে হাজির হল। মস্ত নদী,—তার দুধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে পাহাড়রা দিচ্ছে পাহারা। নদী যে কত দূর গিয়েছে কেউ তা জানে না।

ঢুঁঢুঁ হঠাৎ বললে, হ্যাঁ রে বউ, তোর বাপ আমাকে তোদের ঘরে ঢুকতে দেয় না কেন রে?

ঘর, অর্থাৎ গুহা। তার মধ্যে আছে অগ্নিদেবকে জাগিয়ে রাখবার গুপ্তরহস্য এবং হাঁহাঁ তার জামাইকেও বিশ্বাস করে না। তার পক্ষে এটা অবশ্য অন্যায় নয়। কারণ সেই আদিমযুগের জামাইরা শ্বশুরদেরও খাতির রাখত না।

নিনি তা জানে। আর এটাও তার অজানা নেই যে একবার অগ্নিরহস্য আবিষ্কার করতে পারলেই ঢুঁঢুঁর হাতে হাঁহাঁর প্রাণ যাওয়াও আশ্চর্য নয়। বাপের বিপদ কোন মেয়ে চায়?

অতএব ঢুঁঢুঁর প্রশ্ন চাপা দেবার জন্যে সে বললে, বাপের মনের কথা আমি কী জানি? ও কথা চুলোয় যাক, তুই ওই ফুলগুলো তাড়াতাড়ি পেড়ে দে দেখি! বলে সে সামনের একটা ছোটো পাহাড়ের উপরকার একটা গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—ফুল নিয়ে কী করবি?

—গন্ধ শুকব রে বর!

ফুল দিয়ে যে মালা গাঁথা যায় নিনিদের সমাজের মেয়েরা তা জানত না।

ঢুঁঢুঁ হাতের প্রচণ্ড পাথুরে মুগুরটার উপরে ভর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নিনি ঘাসের উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

উঁচু গাছের ডালের উপরে উঠে ঢুঁঢুঁ কিন্তু ফুল পাড়বার নামও করলে না, নদীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বসে রইল চিত্রার্পিতের মতো।

নিনি নীচে থেকে ধমক দিয়ে বলে, এই কুঁড়ে বর, ফুল পাড় না!

তবু ঢুঁঢুঁর মুখে নেই রা!

নিনি বললে, হাঁ করে ওদিকে কী দেখছিস রে বর? কখনও কি নদী দেখিসনি?

—নদী ঢের দেখেছি রে বউ, কিন্তু নদীতে অমন সব জানোয়ারকে কখনও সাঁতার কাটতে দেখিনি তো।

—জানোয়ার? কী জানোয়ার? হাতি-টাতি?

—উহু! বেয়াড়া জানোয়ার। দুদিকে ঝপাং ঝপাং করে হাত ফেলে সাতার কাটছে। আর ওদের পিঠের ওপরে বসে পাঁচ-ছ জন করে মানুষ।

—দূর বোকা বর। জলে জানোয়ারের পিঠে চড়ে মানুষ কখনও বেড়াতে পারে?

—বেড়াতে পারে কী, বেড়াচ্ছে। বিশ্বাস না হয়, পাহাড়ে উঠে দেখ।

বিষম কৌতুহলে নিনি চঞ্চল হরিণীর মতন দ্রুত চরণে পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠল। সবিস্ময়ে দেখলে, ঢুঁঢুঁর কথা তো মিথ্যা নয়। একটা নয়, দুটো নয়, পরে পরে বিশ-পচিশটা অদ্ভুত জানোয়ার। তাদের প্রত্যেকের পিঠে রয়েছে পাঁচ-সাত জন করে মানুষ।

নিনি সভয়ে বললে, ওরে বর, জানোয়ারগুলো যে একে একে আমাদের কাছেই তীরে এসে দাঁড়াচ্ছে। ওই দেখ, মানুষগুলোও ওদের পিঠ থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ছে। চল, পালাই চল।

ঢুঁঢুঁ বললে, না রে, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। এইখানে লুকিয়ে থেকে ওরা কী করে দেখ না?

সে-যুগে মানুষের মন ছিল অনেকটা জন্তুর মতো। পথে একটা কুকুরের সঙ্গে আর একটা অচেনা কুকুরের দেখা হলেই মারামারি কামড়া-কামড়ি হয়। তখনও চেনাশুনা না থাকলেই এক মানুষ করত আর এক মানুষকে আক্রমণ বিনাবাক্যব্যয়ে। আজ হাজার হাজার বৎসরে পরেও মানুষ-শিশুর মনে এই ভাবেরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অচেনা লোক দেখলেই শিশু ভয়ে কেঁদে ফেলে। কাজেই অন্তত পনেরো হাজার বছর আগেরকার বুনো মেয়ে নিনির মনে অপরিচিতকে দেখে ভয়ের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক।

হঠাৎ ঢুঁঢুঁ, সচকিত কণ্ঠে বললে, ও বউ, দেখ দেখ। কুকুর। ওদের সঙ্গে বড়ো বড়ো কুকুর রয়েছে। কুকুরগুলো আবার ওদের সঙ্গে ল্যাজ নেড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে। মানুষের সঙ্গে কুকুরের ভাব। আজব কাণ্ড।

হাঁহাঁ, হুঁহুঁ, ঢুঁঢুঁ প্রভৃতি যে সমাজে মানুষ হয়ে জন্মেছে, সে সমাজের কেউ কখনও গৃহপালিত জন্তুর কথা শোনেনি। জন্তু দেখলেই মাংস খাবার জন্যে তারা বধ করত, তাদের পোষ মানিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা কেউ করত না।

নিনি বললে, দেখ বর, দেখ। একটা মানুষ আমাদের খুব কাছে এসেছে। এ কোনও দেশের নতুন মানুষ?

—হাঁ রে বউ, তাই তো! ওর গায়ের রং আমাদের মতো কালো কুচকুচে নয়, সাদা সাদা বিচ্ছিরি! ওর মাথার চুলগুলো আমাদের মতো উশকোখুশকো নয়—সাজানো-গোছানো চকচকে! নিনি দুই চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে বললে, ছিছি ও কী কুচ্ছিৎ চেহারা! তোর নাকটি কেমন খাসা থ্যাবড়া, আর ওর নাকটা উঁচু, লম্বা! লোকটার গায়ে বড়ো বড়ো লোম পর্যন্ত নেই। গড়নও ছিপছিপে, তোর মতন বুক ওর চওড়া নয়। মাথাতেও বেমানান লম্বা। তুই কেমন বেঁটে-সেটে।

ঢুঁঢুঁ বললে, আমরা চলি হেলেদুলে, আর ওরা চলছে সিধে হয়ে গট গট করে! আবার দেখ, ওরা আমাদের মতো চামড়ার কাপড় পরতে জানে না! ওরা কী দিয়ে কাপড় তৈরি করেছে বল দেখি!

নিনি তাচ্ছিল্যভরে বললে, কে জানে! আরে ছ্যাঁঃ, ওগুলো কি মানুষ, না টিকটিকি? তুই একলা এক চড়ে ওদের পাঁচ-সাতজনকে মেরে ফেলতে পারিস।

—চুপ বউ, কথা কোসনে লোকটা পাহাড়ের ওপরে উঠছে। দাঁড়া, ওকে একটু মজা দেখাই!

লোকটা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে পাহাড়ের উপরে উঠছে ধীরে ধীরে, শিয়রে যে কতবড়ো বিপদ ওঁত পেতে আছে সেটা টেরও পেলে না।

ঢুঁঢুঁ পাহাড়ের গা থেকে বেছে বেছে মস্ত একখানা পাথর তুলে নিলে। তারপর বেশ টিপ করে পাথরখানা ছুঁড়লে।

লোকটা বেজায় জোরে আর্তনাদ করে একেবারে ঠিকরে সটান পড়ে গেল, তারপর পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচের দিকে!

তার চিৎকার শোনবামাত্র নদীর ধার থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো প্রকাণ্ড কুকুরও!

নিনি নিজেদের গুহার পথে ছুটতে ছুটতে বললে, ও বর, পালিয়ে আয় রে!

কিন্তু তার কথা শোনবার আগেই ঢুঁঢুঁ পালাতে শুরু করেছে! বনজঙ্গল ভেঙে, খানা-ডোবা ডিঙিয়ে, পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ঢুঁঢুঁ ও নিনি যখন গুহার কাছে গিয়ে পড়ল, হাঁহাঁ তখন সপরিবারে গুহার সামনে ভোজে বসেছে। ভোজ তো ভারী! কতগুলো গাছের শিকড় ও বন্য কুকুরের আধপোড়া মাংস।

হাঁহাঁ কুকুরের একখানা আস্ত ঠ্যাং তুলে নিয়ে, তার রান-এ মস্ত কামড় মেরে খুব-খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বললে, আরে আরে, জামাইটার সঙ্গে আমার বেটি অমন ছুটে আসছে কেন রে?

হুয়া বললে, তাই তো কর্তা! তোর প্রতাপে দেশ তো এখন ঠান্ডা, তবু ওরা ভয় পেয়েছে কেন?

সত্যি, আশ্চর্য হবার কথাই বটে। হাঁহাঁর খোকা-আগুনের গুণ দেখে কেবল যে গুহাভালুকরা ও খাঁড়াদেঁতোরাই সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে, তা নয়; হুঁহুঁ-সর্দারের মতো আরও য়েকজন ছোটো-বড়ো সর্দার ভক্তের মতন এসে তার দল খুব ভারী করে তুলেছে। সে অঞ্চলে হাঁহাঁর শত্রু কেউ নেই, সকলেরই মুখে তার জয়ধ্বনি! সকলেই জানে এখন হাঁহাঁসর্দারের আশ্রয়ে থাকার মানেই হচ্ছে, পর্বতের আড়ালে থাকা। এদেশে তার মেয়ে-জামাইকে ভয় দেখাবে, এতবড়ো বুকের পাটা কার?

ঢুঁঢুঁ কাছে এসেই বললে, ওরে শ্বশুর, নতুন মানুষ এসেছে!

হাঁহাঁ আশ্চর্য হয়ে বললে, আমি জানি না, আমার মুল্লুকে নতুন মানুষ!

নিনি বললে, হ্যাঁ রে বাপ! তারা জানোয়ারের পিঠে চড়ে নদীর জলে বেড়ায়, তাদের রং সাদা, গায়ে লোম নেই, নাক খ্যাদা নয়! হাড়-কুচ্ছিৎ!

ঢুঁঢুঁ বললে, গতরেও তারা আমাদের আধখানা! আমাদের চেয়ে মাথায় তারা লম্বা হতে পারে, কিন্তু চওড়ায় তারা একদম বাজে! তুই ফুঁ দিলে তারা উড়ে যায় রে সর্দার!

—ফুঁ দেব না রে হুঁহুঁর বেটা, খোকা-আগুনকে লেলিয়ে দেব! আমার মুল্লুকে নতুন মানুষ! দলে তারা পুরু নাকি রে?

—হ্যা সর্দার!

—আমাদের চেয়েও?

—তা হবে না বোধহয়?

—কোথায় তারা?

—কল-কল নদীর ধারে।

হাঁহাঁ একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালে। চারিদিকে গোধূলির আলো জ্বলছে, পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসছে বাসার পানে।

টুটু বললে, কল-কল নদীর ধারে এখন যেতে-যেতেই আঁধার নামবে রে বাপ!

হাঁহাঁ বললে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আজকের রাতটা চুপচাপ থাকা যাক, কী বলিস রে?

—সেই ভালো।

—তারপর কাল সকালে দলবল নিয়ে নতুন মানুষদের ঘাড় ভাঙতে যাব। বলেই হাঁহাঁ আবার কুকুরের আধপোড়া ঠ্যাংখানা হাতে করে তুলে নিলে।

হারা আলো

কল-কল নদীর অশ্রান্ত কল্লোলে সেখানে সংগীতের অভাব হয়নি কোনওদিন, একমুহুর্তের জন্যে।

কোকিল আছে, পাপিয়া আছে, ময়ূর আছে—আরও কত রংবেরঙের পাখি আছে, সকলকার নাম কে করে ঃ চুটকি সুর শোনাবার জন্যে আছে ভোমর, আছে মৌমাছি। তারা সবাই হচ্ছে বনভূমির বাধা গাইয়ে। মাইনে পায় যত খুশি পাকা ফল, ফুলের মউ।

অরসিক পাখিগুলোও ছিল তখন। কাক, চিল, চড়াই, প্যাঁচা। কা-কা-কা-কা, চিঁহি-চিঁহি, কিচির-মিচির, চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে যারা ভাবে জবর-ওস্তাদি গান গাইছি।

মর্মরিত বনভূমি রাগ করে বলে—মর মর মর মর কিন্তু অরসিকরা মরতে কিংবা চুপ করতে রাজি নয়। তারা আজও মরেনি বা চুপ করেনি। অসাধারণ তাদের ধৈর্য।

এই সংগীতের সুরে-বেসুরে মুখরিত নদীর ধারে একটা উঁচু জমির উপরে নতুন মানুষদের তাবু পড়েছে সারে সারে।

হাঁহাঁদের সঙ্গে এদের চেহারার কত তফাত! হাঁহাঁদের কপাল, নাক, চিবুক, গলা ও চলবার কায়দা ছিল বনমানুষের মতো, কিন্তু এদের দেখলে তোমরা মনে করতে, হ্যাঁ, এরা আমাদেরই জাত বটে। এই নতুন মানুষদের বংশধররা আজও ভারতের নানা স্থানে বাস করে বলে বিশ্বাস হয়। হয়তো অন্য জাতির সঙ্গে মিশে এরাই পরে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত দ্রাবিড়ি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পায় যে পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার রাজ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গেও নতুন মানুষদের সম্পর্ক ছিল, এমন অনুমানও করা যেতে পারে।

ইতিহাস বলে, আর্যরা যখন মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন উত্তর ভারতে যারা বাস করত তাদের সঙ্গে তারা অনেককাল ধরে যুদ্ধ করেছিল।

তারা কারা? আমরা যাদের কথা এখন বলছি তারাই যে বিদেশি আর্যদের কবল থেকে স্বদেশকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, এমন অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। বহুযুগব্যাপী সেই যুদ্ধে বার বার হেরে তারা ক্রমশ বিন্ধ্যাচল পার হয়ে ভারতের দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে। আর্যরা তাদের নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাননি এবং মাঝে মাঝে মাথা ঘামিয়েও আর তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেননি। এমনকী মুসলমান-প্রভাব স্বীকার করে সমগ্র আর্যাবর্তের আর্যরা যখন ত্রিয়মান, দক্ষিণ ভারত তখন এবং তারপরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপন স্বাধীনতা রেখেছিল অক্ষুণ্ন।

আর্যরা তাদের অমানুষ' বলতেন না বটে, কিন্তু তারা আর্য জাতীয় নয় বলে ঘৃণাভরে তাদের 'অনার্য' নামে ডাকতেন। অনার্য বলতে অসভ্য বোঝায় না। কারণ তারাই জ্বেলেছিল ভারতবর্ষে প্রথম সভ্যতার প্রদীপ। আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন সেই সভ্যতার প্রদীপশিখা বড়ো অল্প-উজ্জ্বল ছিল না।

আর্যদের মতন এই নতুন মানুষরাও বাহির থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। পৃথিবী তখন আজকের মতন জনবহুল ছিল না, তার অধিকাংশই ছিল নির্জন। কোথাও যখন খাবারের অভাব হত বা অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির কাছে আর এক জাতি পরাজিত হত, তখন এক দেশের লোক চলে যেত দলে দলে অন্য দেশে।

এইরকম সব কারণে একদল নতুন (বা ক্রো-ম্যাগনন জাতীয়) মানুষ ইউরোপে প্রবেশ করে। কারুর মতে তারা এসেছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে, কেউ বলেন, এশিয়া থেকে। তারপর সেখানে হাঁহাঁদের জাতভাইদের হারিয়ে আস্তানা

স্থাপন করে। এবং মেসোপটেমিয়া বা পারস্য অঞ্চল বা অন্য কোথাও থেকে আর একদল ঢোকে ভারতবর্ষে। হাঁহাঁদের জাতের চেয়ে সভ্যতায় ও চেহারায় তারা ছিল অনেক উন্নত। পণ্ডিতরা তাদের পৃথিবীর প্রথম সত্যিকার মানুষ বলেন। এবং তারাও হাঁহাঁদের জাতকে মানুষের জাত বলে মনে করত না। অনেকের মত হচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশেরই পুরাতন রূপকথায় যেসব ভীষণদর্শন রাক্ষস-খোক্কসের বর্ণনা পাওয়া যায়, হাঁহাঁদের জাতের মানুষ থেকেই তাদের উৎপত্তি।

হাঁহাঁদের জাতের কোনও মানুষ আজ আর পৃথিবীতে বেঁচে নেই। প্রাচীন মিশরি ও ইতালির আদিম বাসিন্দা ইত্রাস্কান প্রভৃতি জাতিদের মতো তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। সম্ভবত একালের কোনও কোনও অসভ্য জাতিদের মধ্যে খুঁজলে তাদের রক্ত পাওয়া যাবে।

আর্যদেরও নানা দল পরে নানা কারণে তাদের প্রথম স্বদেশ মধ্য এশিয়া ছাড়তে বাধ্য হন। একদল আসে ভারতবর্ষে, আর একদল যায় পারস্যে, আর একদল ঢোকে ইউরোপে। এই তিন দেশেই তখন প্রথম সত্যিকার মানুষরা বাস করত। তিন দেশেই যুদ্ধে তারা আর্যদের কাছে হেরে যায়। হেরে কতক এদিক-ওদিক সরে পড়ে এবং কতক মিলেমিশে যায় আর্যদেরই সঙ্গে। ইউরোপে যেমন আর্যদের সঙ্গে মিশেছে অনার্যদের রক্ত, ভারতেও তেমনি মারাঠি, বাঙালি, বিহারি ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দুস্থানি প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে অনার্য রক্ত আছে।

গল্প শুনতে শুনতে এসব কথা হয়তো তোমাদের শুকনো বলে মনে হচ্ছে! বেশ, তবে গল্পই শোনো।

বলছিলুম কী, কল-কল নদীর ধারে একটা উঁচু জমির উপরে পড়েছে নতুন মানুষদের তাঁবু। তাবুগুলো জানোয়ারদের শুকনো চামড়া সেলাই করে তৈরি।

কিন্তু হাহঁদের মতন তারা চামড়া পরে না। তারা পরে গাছের ছালে তৈরি পোশাক— ভারতে যা বল্কল বা বাকল নামে বিখ্যাত।

নিনির মত শুনেছ তো? তারা নাকি ফরসা! হ্যাঁ, তারা নিনিদের চেয়ে ফরসা নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের বর্ণ গৌর বলা যায় না। আর্যদের চোখে তারা কালোই ছিল। যেমন কাফ্রিদের চোখে আমরা ফরসা হলেও সাহেবদের চোখে কালো।

নতুন মানুষদের অনেকগুলো দল উত্তর ভারতের নানা দিকে গিয়েছে। একটা দল এসেছে এইখানে। ছেলে বুড়ো মেয়ে বাদ দিলেও দলে সক্ষম যোদ্ধা আছে তিনশোর কম নয়।

সেদিন সকালে আলোর সঙ্গে পাখিরা জেগে উঠেই দেখলে, নতুন মানুষদের দলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেছে।

তাঁবুর ভিতরে বসে মেয়েরা জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখছে, কেউ শিকারে মারা জানোয়ারের রোমশ ছালে তৈরি বিছানা তুলে নিয়ে রোদে শুকোতে দিতে যাচ্ছে, কেউ নদী থেকে মাটির কলসি ভরে জল নিয়ে আসছে, কেউ মাটির বাসন কোসন মাজছে, কেউ উনুন ধরাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও তখন কোনও ধাতু আবিষ্কৃত হয়নি, মাটির বাসনই ছিল অতি বড়ো সভ্যের ব্যবহার্য। দলের সর্দার ও হোমরা-চোমরারা বড়োজ্যের পাথরের ঘটি, বাটি, থালা ব্যবহার করে বিলাসিতার পরিচয় দিতে পারতেন।

এ দলের সর্দারের নাম সূর্য। দলের মধ্যে সবচেয়ে তেজি, বলী ও বুদ্ধিমান বলেই তিনি সর্দারির পদ পেয়েছেন। সে যুগে সর্দারের ছেলে বা ভাই হলেই কেউ সর্দারি পেত না। দলের লোকরা যাকে যোগ্য ও বুদ্ধিমান মনে করত সর্দারি দিত তাকেই।

সূর্য-সর্দারের দুই ছেলে—অগ্নি ও বায়ু! এক মেয়ে, নাম আলো।

প্রথম যুগের মানুষরা সকলেই ছিল প্রকৃতির ভক্ত। সূর্য-চন্দ্রের উদয়াস্ত লীলা, ঝঞ্ঝা পবনের বিরাট শক্তি, মহাসাগরের নৃত্যশীল অসীম উচ্ছ্বাস, অনাহত আকাশের অনন্ত নীলিমা প্রভৃতি দেখে তাদের মন হত বিস্মিত, অভিভূত। ভাষার

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষরা প্রাকৃতিক প্রত্যেক বিশেষত্বের এক-একটা নাম রাখলে এবং সেইসব নামেই নিজেদেরও ডাকতে শুরু করলে। এ প্রথা আজও লুপ্ত হয়নি।

সূর্য-সর্দার বলছিলেন, ওরে অগ্নি, নতুন দেশে এসেছি, কোথায় কী পাওয়া যায় জানি না তো! খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে?

অগ্নির বয়স বছর চব্বিশ, বায়ুর চেয়ে তিন বছরের বড়ো। ছিপছিপে অথচ বলিষ্ঠ দেহ, তার চোখ, হাত, পা সর্বক্ষণই চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে! সে বললে, কেন বাবা, কাল আসতে আসতে বনে তো অনেক হরিণ দেখেছি! বায়ুকে নিয়ে আমি শিকারে চললুম।

—কিন্তু শিকার যদি না পাস?

শিকার না পাওয়া তখন বড়ো ভাবনার বিষয় ছিল। কারণ মানুষ তখনও চাষ করতে শেখেনি, ভাত, ডাল, রুটি প্রভৃতি দিয়ে উদর পূরণ করবার উপায় ছিল না। শাক-সবজির ব্যবহারও ছিল না। বড়োজোর বনে কোনও কোনওরকম ফলমূল পাওয়া যেত। কিন্তু মাংসই ছিল প্রায় একমাত্র আহার্য।

এমন সময়ে এক কোণ থেকে কোঁকড়ানো চুল দুলিয়ে আলো ছুটে এল। বয়স ষোলো। দাদা অগ্নির মতোই চঞ্চল। মুখে-চোখে উছলে উঠছে কৌতুকহাসি। এসেই বললে, বাবা, বাবা! দাদা বনে হরিণ দেখেছে, আর আমি দেখেছি ওই নদীতে বড়ো বড়ো মাছ!

সূর্য-সর্দার সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, ভালো খবর দিলি। চল, তোকে নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাই। আমার আজ শিকারে যাবার বা এখান থেকে নড়বার উপায় নেই—নতুন জায়গায় এসেছি, সবাই কথায় কথায় পরামর্শ করতে আর উপদেশ নিতে আসছে।... বায়ু, নিয়ে আয় তোআমার হাত সুতো।

বায়ু এনে দিলে। তখনও ছিপের বা জালের আবিষ্কার হয়নি, বেশি-সভ্য মানুষরা চামড়ার তন্ত্র দিয়ে তৈরি হাত-সুতোর পাথর বা হাড় দিয়ে প্রস্তুত বড়শি

পরিয়ে মাছ ধরত। কিন্তু মাছ ধরবার এ কৌশলও তখন হাঁহাঁ-হুঁহুঁদের জগতে ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।

বাবার সঙ্গে প্রায় নাচতে নাচতে আলো বেরিয়ে গেল তাবুর ভিতর থেকে। অগ্নি তখন নিজের ও ভাইয়ের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র বার করছে। চকমকি পাথরের কুঠার, ছুরি, বর্শা। আরও দুটি অস্ত্র বার করলে—সে যুগের যা অশ্রুতপূর্ব মহাআবিষ্কার! ধনুক! বাঁশের ধনুক, কঞ্চির বাণ। বাণের ফলা পাথরের। তখনও তৃণ গড়তে কেউ শেখেনি, তাই বাণগুলোকে গোছা করে দড়িতে বেঁধে দেহের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হত।

অগ্নি ব্যবহার করতে শিখে জীবরাজ্যে মানুষ প্রথমে হয়েছিল সবচেয়ে বেশি শক্তিধর। তার পরের প্রধান আবিষ্কাররূপে ধনুকবাণের নাম করলে ভুল হবে না। শিকারি মানুষদের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো অস্ত্র আদিম পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কেবল আদিম পৃথিবীতে কেন, মধ্যযুগের সভ্য পৃথিবীও যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুকবাণকেই মনে করত সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। আধুনিক যুগেও যেসব পশ্চাৎপদ জাতি বনে-জঙ্গলে বসতি বাধে, ধনুকবাণই হচ্ছে তাদের আত্মরক্ষার ও শিকার সংগ্রহের প্রথম উপায়। এই সেদিনও তিব্বতিরা ধনুকবাণ নিয়ে পাল্লা দিতে চেয়েছিল ইংরাজদের বন্দুকের সঙ্গে। একশো বছর আগে জাপানিরাও ব্যবহার করত ধনুক ও বাণ।

অগ্নি ও বায়ু তাবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে দেখলে, দলের অন্যান্য লোকরা এখানে-ওখানে নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ পাথরের ছেনি মুগুর দিয়ে চকমকি কেটে অস্ত্র তৈরি করছে, কেউ ভোঁতা অস্ত্র ঘষে ঘষে ধারালো করে তুলছে, কেউ ফলগাছে উঠে ফললাভের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়ে আছে।

অগ্নি চেঁচিয়ে বললে, আমার সঙ্গে কে শিকারে যাবে এসো।

জন-ছয়েক লোক তাদের সঙ্গী হল। গোটাচারেক কুকুরও পিছু নিলে। বায়ু বললে, বাঃ, আর কেউ যে এল না? ওরা কি আজ উপোস করবে?

উত্তরে সঙ্গীদের একজন বললে, হুঃ, ওরা উপোস করবার পাত্রই বটে!

—তবে? ওরা কি হাওয়া খেয়েই উপবাস ভঙ্গ করবে?

—কদিন সমানে পথ হেঁটে হেঁটে ওরা ভারী শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখানকার নদীতে অনেক মাছ আর গাছে অনেক পাখি দেখে ওরা স্থির করেছে আজ আর বনে-জঙ্গলে ঢুকবে না। মারবে গাছের পাখি, ধরবে নদীর মাছ।

অগ্নি বললে, আমাদের দল বড়ো অল্পেই কাবু হয়ে পড়তে শুরু করেছে। পনেরো দিনে একশো ক্রোশ পথ হেঁটে যাদের পায়ে ব্যথা হয়, তাদের আমি পুরুষ বলে গণ্য করি না! এমনি সব কথা কইতে কইতে আটজন শিকারি প্রথমে অনিবিড় জঙ্গল ও তারপর গভীর অরণ্যের ভিতরে গিয়ে পড়ল। সে জঙ্গল এমন নিরেট, স্তব্ধ ও স্থির যে তার বহুস্থানেই যেন বায়ু-চলাচল পর্যন্ত নেই! পাখিরা পর্যন্ত সেসব জায়গায় ঢুকতে বোধহয় ভয় পায়, কারণ গান না গেয়ে যারা থাকতে পারে না সেখানে তারা একেবারেই নীরব। মাঝে মাঝে পথ ও একটুআধটু খোলা জমি, বাকি সর্বত্রই মস্ত মস্ত গাছ পরস্পরকে জড়াজড়ি করে লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের তলায় অন্ধকারের সঙ্গে যেন সন্ধ্যার ম্লান আলো আলাপ করছে মৌন ভাষায়। চারিদিকেই কী যেন একটা বুকচাপা ভয় দম বন্ধ করে বসে আছে, চারিদিকেই কারা যেন অদৃশ্য পা ফেলে জীবনকে হত্যা করবার পরামর্শ করছে নির্বাক মুখে, অজানা ইঙ্গিতে! পাছে কোনও পশু মানুষের পায়ের শব্দ শুনে সাবধান হয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে শিকারিরা পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। নতুন মানুষরা প্রথম সভ্যতার আস্বাদ পেলেও তখনও তারা বন্য প্রকৃতিরই আদিম সন্তান। তারা যেমন নিঃশব্দে অরণ্যের সঙ্গে মিশিয়ে থাকতে পারত, একালের কোনও অর্ধ-সভ্য মানুষও তা পারে না।

এমন সময়ে এক কাণ্ড হল। কথাটা খুলেই বলি। তোমরা সেই গুহাবাসী ভালুক ও ভালুকিকে নিশ্চয়ই ভোলোনি। তারা পুরানো বাসা ছেড়ে এই অরণ্যেরই

নিকটবর্তী এক গিরিগুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ভেবেছিল মানুষের মুখ আর দেখবে না। অপয়া মুখ!

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভালুকি জানালে যে, মৌচাকের সন্ধানে সে বনের ভিতরে একবার টহল মেরে আসতে চায়। ভাল্লুকও মতপ্রকাশ করলে, এ প্রস্তাব মন্দ নয়। সে-ও যাবে। দুজনেই উর্ধ্বমুখে এগিয়ে আসতে আসতে দেখছিল, কোন গাছের ডালে আছে মৌমাছিদের বাসা!

হঠাৎ একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রথম বেরিয়ে ভালুক চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! হাত বিশ তফাতেই কজন মানুষ!

মানুষরাও তাকে দেখেছিল, তারাও বড়ো কম চমকে উঠল না। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভালুক-জায়ার আওয়াজ এল—ঘুক ঘুক? অর্থাৎ ব্যাপার কী?

দারুণ ঘৃণায় ও ক্রোধে ভালুক বললে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ঘোঁৎউম, ঘোঁৎউম!—অর্থাৎ দুচোখের বালি গিন্নি, মানুষ—মানুষ!

গিন্নি বললে, ঘোঁৎকু, ঘোঁৎকু —অর্থাৎ বলো কী, বলো কী বলতে বলতে সেই ঝোপ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে অগ্নি বললে, হুশিয়ার! চটপট সবাই ধনুকে বাণ লাগাঁও!

সকলেই চোখের নিমেষে ধনুকে জুড়লে বাণ! কিন্তু ভালুক ভয় পেলে না, ভালুকিও নয়। কারণ তারা এরইমধ্যে চট করে দেখে নিয়েছিল যে, এই ধড়িবাজ মানুষগুলোর হাতে সেই দাউদাউ, জ্বলজ্বল-করা ভয়ানক জিনিসগুলো নেই।

উঁচু হয়ে, হেট হয়ে, ঘাড় কত করে, একটু এপাশে একটু ওপাশে গিয়ে ধনুকবাণগুলো ভালো করে দেখে নিয়ে ভালুক বললে, গিন্নি, হেসেই মরি। এই মানুষগুলো গোটাকয় কাঠি নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে!

ভালুকি বললে, কর্তা, মধু নয়, অনেকদিন পরে আজ আবার মানুষ খাব। চলো, ওদের ঘাড় ভাঙি।

ভালুক ও ভালুকি তেড়ে এল। অগ্নি বললে, ছাড়ো বাণ! বন-বন করে এক ঝাঁক তির ছুটে এল। পাথরের তির হলেও ঘষে ঘষে তাদের ফলাগুলো এমন সূঁচালো করে তোলা হয়েছে যে, গণ্ডার ছাড়া আর সব জীবের চামড়া ভেদ করতে পারে অনায়াসেই। ভালুকের পিঠের উপরে ও সামনের ডান পায়ের উপরে এসে বিঁধল দুটো বাণ। ভালুকির বিশেষ কিছু হল না বটে কিন্তু একটা বাণে তার এক কান হয়ে গেল এ-ফোঁড় ও ফোঁড়। ভালুক গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে বললে, পালাও গিন্নি, পালাও! আমি পালালুম!

ভালুকি কর্তার উপদেশ শোনবার জন্যে অপেক্ষা করেনি, আগেই অদৃশ্য হয়েছে। বন পেরিয়ে, পাহাড়ে উঠে, গুহায় ঢুকে জিভ বার করে শুয়ে পড়ে ভালুক দেখলে, ভালুকি আগেই সেখানে হাজির হয়ে ফোঁড়া কানটা ক্রমাগত নাড়ছে!

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে ভালুক বললে, কী দেখলুম! কাঠি ছুড়ে কাবু করলে। ভালুকি ছটফট করতে করতে বললে, জ্বলে মরি গো, জ্বলে মরি! এ কানে আর শুনতে পাব না?

ভালুক বললে, এ বনও ছাড়তে হল গিন্নি। চলো, আমরা হিমালয়ে গিয়ে উঠি। মানুষ সেখানে যাবে না?

ভালুকি সায় দিয়ে বললে, তাই ভালো কর্তা! মানুষগুলো কাপুরুষ। তারা আমাদের কাছে আসে না। দূর থেকে কী সব ছোড়ে, কিচ্ছু মানে হয় না। ওদের দেখলে ঘেন্না হয়। ওদের কাছে থাকা অসম্ভব।

তারা হিমালয়ে প্রস্থান করলে। আজও তাদের বংশধররা হিমালয়ে বাস করছে।

...ওদিকে সূর্য-সর্দার কল-কল নদীর ধারে বসে মাছ ধরছেন। এরই মধ্যে মস্ত একটা মহাশের মাছ ধরে আবার তিনি জলে হাতসুতো ফেলেছেন।

মাছ ধরতে ধরতে মাঝে মাঝে তিনি মুখ তুলে দেখছেন, নদীর ওপারে অনেক দূরে নীলাকাশের তলায় সাদা নিরেট মেঘের মতো স্থির হয়ে আছে চির-

তুষারের চাদর গায়ে দিয়ে মহাগিরি হিমালয়। তার পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে অগণ্য শিখর-কন্টকিত বহুদূরব্যাপী ধূসর পর্বত-সাম্রাজ্য। তারও নীচে রয়েছে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে সীমাহীন নীল-অরণ্যের দেশ। বন যেখানে আরও কাছে নদীর ওপারের দিকে এগিয়ে এসেছে সেখানে তার রং হয়ে উঠেছে গাঢ়-শ্যামল থেকে ক্রমেই কচি-সবুজ। বনের আগেই এবং নদীর বালুরেখার পরেই দেখা যাচ্ছে দুর্বাঘাসে-মোড়া প্রান্তর, তার বুকে চরছে হরিণ ও বন্য মহিষের দল। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ম্যামথ হাতিরা দল বেঁধে নদীর ধারে আসছে জলপান করবার জন্যে। তাদের আগা বাঁকানো লম্বা লম্বা দাঁতগুলোর উপরে জ্বলে জ্বলে উঠছে সূর্যকর।

সূর্য-সর্দার নিজের মনেই বললেন, থাকবার জন্যে খুব ভালো জায়গাই নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে জলাভাব হবে না, নদীতে আছে মাছ, গাছে আছে ফল আর পাখি, বনে আছে অগুনতি শিকারের পশু। দীর্ঘকালের জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারব!

আলো খানিকক্ষণ নদীর ধারে বসে বালি দিয়ে ছোটো একটা কিন্তুতকিমাকার জন্তুর মূর্তি গড়বার চেষ্টা করলে। তারপর কিছুক্ষণ ধরে একটা মুখর কোকিলের ডাক নকল করতে লাগল। তারপর সুন্দর একটি প্রজাপতি দেখে ছুটল তারই পিছনে পিছনে। প্রজাপতিও ধরা দেবে না, সে-ও ছাড়বে না। ছুটতে ছুটতে সেই পাহাড়ের কাছে গিয়ে পড়ল, যার উপরে ফুলগাছ দেখে নিনি কাল আবদার ধরেছিল।

সূর্য-সর্দারের হাতসুতোয় তখন আর একটা মাছ টান মেরেছে, তিনি সুতো গুটিয়ে তাকে ডাঙায় আনতে ব্যস্ত।

আচম্বিতে দূর থেকে আলোর ভীত, আর্তস্বর জাগল, বাবা, বাবা! রাক্ষস, রাক্ষস!

সচমকে ফিরে দেখেই সূর্য-সর্দারের চক্ষু স্থির!

বিকটদর্শন বিপুলবপু এক ভয়াবহ মূর্তির কবলে পড়ে আলো ধ্বস্তাধবস্তি করছে প্রাণপণে এবং পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে সেই রকম দেখতে আরও চার-চারটে মূর্তি। তারা হচ্ছে হুঁহুঁ, টুঁটুঁ, টুটু, ঘটু।

প্রথমটা সূর্য-সর্দার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এইমাত্র তিনি ভাবছিলেন এখানে এসে নিশ্চিন্ত হবেন, তা হলে এখানেও রাক্ষসের দল আছে? অবশ্য এরা তার অপরিচিত নয়, কারণ যেদেশ থেকে নতুন মানুষরা এসেছে সেখানেও এই রকম রাক্ষসরা তাদের উপরে অত্যাচার করে। এরা মানুষদের মেয়ে ধরে নিয়ে যায় এবং পুরুষদের নিয়ে গিয়ে মেরে মাংস খায়। তাহলে কাল তার দলের একজন লোককে পাথর ছুড়ে মেরেছিল এরাই?

আলো কাতর স্বরে আবার ডাকলে, বাবা, বাবা, বাবা!

কী বিপদ! তিনি যে নির্বোধের মতো কোনও অস্ত্র না নিয়েই মাছ ধরতে এসেছেন! তবু শুধু হাতেই মেয়ের দিকে ছুটলেন।

ওদিকে দলের অন্যান্য লোকরাও আলোর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। চারিদিক থেকে হই-হই রব তুলে তারাও বেগে ছুটে আসতে লাগল।

কিন্তু কেউ কাছে আসবার আগেই রাক্ষসরা আলোকে নিয়ে পাহাড় ও জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য-সর্দার দলবল নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলেন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। আলোর কান্নাও আর শোনা যায় না।

সূর্য-সর্দার পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, ওরে, আলো যে মা-মরা মেয়ে! আমিই যে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি! খোঁজ, খোঁজ, চারিদিকে খোঁজ, সারা পৃথিবী খোঁজ! রাক্ষসদের হত্যা কর, যেখান থেকে হোক আলোকে আমার কোলে ফিরিয়ে আন!’ বলতে বলতে শোকে ভেঙে তিনি সেখানেই বসে পড়লেন।

আলোর খোঁজে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে নতুন মানুষ। সূর্য-সর্দার ভূমিতলে জানু পেতে বসে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সাশ্রুনেত্রে ভগ্নস্বরে বললেন, সৃষ্টির প্রথম দেবতা, হে সূর্যদেব। অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আনাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। আমার অন্ধকার মনে আমার হারা আলোকে আবার ফিরিয়ে আনো প্রভু! হে সূর্যদেব! হে মানুষের প্রথম দেবতা...

হুয়া আজও বেঁচে আছে

হাঁহাঁর বিপুল স্কন্ধের উপরে আলোর অজ্ঞান দেহ। তার পিছনে আসছে হুঁহুঁ, টুঁটুঁ, টুটু ও ঘটু।

প্রথম অনেকখানি পথ তারা দ্রুতবেগে উর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে এল। এখানকার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্ত পথই তাদের নখদর্পণে এবং কোন পথ দিয়ে সরে পড়লে এ প্রদেশে সব আগুন্তক অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে একথা তারা ভালোরকমই জানত।

কখনও নিবিড় জঙ্গলের মধ্যবর্তী ঘুটঘুটে শুড়িপথ দিয়ে, কখনও পাহাড়ের মাঝখানকার খাদ লাফ মেরে পার হয়ে এবং কাটা তাদের রোমশ দেহের বিশেষ ক্ষতি করতে পারত না বলে কখনও কণ্টকবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে তারা অবশেষে এসে পড়ল নিজেদের গুহার অনতিদূরে এক সবুজ রং-মাখানো উপত্যকায়।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁহাঁ কথা কইবার ফাঁক পেলে। হুঁহুঁকে ডেকে বলল, হ্যাঁ রে, ও লোকগুলো কোন মুল্লুক থেকে এল, জনিস কিছু?

হুঁহুঁ বললে, উঁহু! ওগুলো কি মানুষ, না খুদে পোকার বাচ্ছা! কে ওদের নিয়ে মাথা ঘামায়?

—হ্যাঁ, আমাদের এক এক চড়ে ওদের মাথা গুড়ো হয়ে যাবে! ওরা দলে ভারী না হলে আমরা কখনওই পালাতুম না।

—কিন্তু ওদের মাংস ভারী নরম বলেই মনে হল!

—যা বলেছিস, ওদের দেখে আমার জিভে জল আসছিল রে!

টুঁটুঁ বললে, চল না রে শ্বশুর, আমরাও একদিন দল বেঁধে গিয়ে ওদের সবকটাকে ধরে নিয়ে আসি?

হাঁহাঁ সায় দিয়ে বললে, তাই যাব একদিন। অমন কচি মাংস হাতছাড়া করা হবে না।

হুঁহুঁ বললে, কিন্তু ওদের গায়ে জোর কম হলেও হাতে অস্তর আছে, এটা ভুলিস না রে সর্দার?

হাঁহাঁ বড়াই করে বললে, আমার কাছেও খোকা-আগুন আছে, এটা ভুলিস না রে হুঁহুঁ!

টুটু বললে, যাতে ভালুক পালায়—'

হাঁহাঁ বললে, ওই আগুনে পুড়িয়ে আমি ওদের মাংস খাব!

হুঁহুঁ বললে, হয়তো ওরাও অন্য কোনও ফুসমন্তর জানে। নইলে এখানে আসতে সাহস করে?

ঢুঁঢুঁ বাপের কথায় সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ রে শ্বশুর, আমি নিজের চোখে ওদের তিনটে ফুসমন্তর দেখেছি।

—কী কী শুনি।

—কাল দেখেছি ওরা অনেকগুলো হাতওয়ালা জানোয়ারের পিঠে চড়ে জলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

নতুন মানুষরা এসেছিল নৌকো ভাসিয়ে, দাঁড় ফেলে! এমুলুকে নৌকো কেউ দেখেনি, তাই ঢুঁঢুঁ সেই দাঁড়সুদ্ধ নৌকোগুলোকেই হাতওয়ালা জানোয়ার বলে মনে করেছে। বড়ো বড়ো গাছের গুড়ি কেটে, তাদের মাঝখানকার অংশ বার করে ফেলে নতুন মানুষরা সেকেলে নৌকো তৈরি করত। বাংলাদেশের পল্লিগ্রামে এখনও এই উপায়েই কোনও কোনও শ্রেণীর নৌকো প্রস্তুত করা হয়।

হাঁহাঁ বললে, তুই আর কী দেখেছিস রে জামাই?

—আজ দেখলুম ওদের তিন-চার জন কল-কল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে ভেসে ওপারে গিয়ে উঠল।

বানরদের মতন হাঁহাঁদের জাতের মানুষরা নদীকে বড়ো ভয় করত, কারন তারা সাঁতার কাটতে জানত না, বানর ও মানুষ জাতীয় কোনও জীবই অন্যান্য অধিকাংশ পশুর মতো সাঁতার কাটবার শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না। সাঁতার তাদের শিখতে হয়। নতুন মানুষরা মাথা খাটিয়ে সাতার কাটবার কায়দা আবিষ্কার করেছিল।

এইবারে হাঁহাঁ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বললে, অ্যাঁ, বলিস কী রে, বলিস কী রে? মানুষ জলে চলে! বলিস কী রে?

টুঁটুঁ বললে, জলে গেলে তোর খোকা-আগুনও তো মরে যায়! ওরা জলে ঝাপ খেলে কী করবি তুই?

—ওদের ঝাঁপ খেতে দেব কেন রে বোকা? সে কথা যাক, আর কী দেখেছিস তুই?

—ওরা কী-একটা ছুড়ে জলে ফেলে দেয়, আর জলের মাছ ওঠে ডাঙায়। ওদের খাবারের ভাবনা নেই রে!

হুঁহুঁ সভয়ে বললে, কে জানে ওদের আরও কত ফুসমন্তর আছে! ওরা যে আগুন-মন্তর জানে না তাই বা কে বলতে পারে!

আসলে নতুন মানুষরা আগুনকে আরও বেশি বশ করতে পেরেছিল। তারা কেবল অগ্নিকুণ্ডেই আগুন রাখত না, অন্ধকার দূর করবার জন্যে প্রদীপ গড়ে তার গর্ভে চর্বি ও সলিতা রেখে আলো জ্বালাতে পারত এবং মশালের ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল না।

কিন্তু টুঁটুঁর এসব দেখবার সুযোগ হয়নি। কাজেই হুহুর কথা শুনে বললে, ইস, আগুনমন্তর জানবে ওই মানুষ-পোকাগুলো? আরে ছ্যাঃ, অসম্ভব!

এমন সময় আলোর জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমটা সে কিছুই মনে করতে পারেনি। তারপর অনুভব করলে তার সর্বাঙ্গে রাশি রাশি কর্কশ লোমের মতন কী ফুটছে! তার নাকেও লাগল কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ, আলিপুরের পশুশালায়

গেলে এখন আমরা যেরকম দুর্গন্ধ পেয়ে নাকে কাপড়-চাপা দিই!—তখন তার সব মনে পড়ল। নিজের অবস্থা বুঝেই আবার সে চেচিয়ে কাদতে ও হাত-পা ছুড়তে শুরু করে দিলে!

হাঁহাঁ তাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে গজরে উঠতেই ভয়ে তার চিৎকার ও হাত-পা ছোড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

সবাই তখন হাঁহাঁদের গুহার সামনে এসে পড়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে হুয়া গুহাপথের মুখে দাঁড়িয়েছিল। অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলে, তার স্বামীর কাঁধে ঝুলছে এক অদ্ভুত মেয়ের দেহ! তার মাথায় বাধা খোপা (হুয়া খোপা কখনও দেখেনি), গলায় দুলছে কড়ির মালা, দেহে বঙ্কলের বস্ত্র; তার রং কালো নয়, নাক থ্যাবড়া নয়, গলা খাটো নয়; তার মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত নেই, গায়ে লম্বা লম্বা লোম নেই, আঙুলে বড়ো বড়ো ধারালো নখ নেই। ওমা, এ আবার কেমন মেয়ে।

হুঁহুঁ আর ঢুঁঢুঁ গুহার বাইরে ফর্দ জায়গায় থেবড়ি খেয়ে বসে পড়ল, কারণ ভিতরে যে তাদের প্রবেশ নিষেধ এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

হাঁহাঁ গম্ভীর বদনে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলে, কৌতুহলী হুয়াও চলল পিছনে পিছনে। হাঁহাঁ ভিতরে গিয়ে আগে আলোকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। একে বাপের কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে, তার উপরে যারা তাকে কেড়ে এনেছে, তাদের সে মানুষ বলেও ভাবতে পারছে না, তার চোখে এরা রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এরা যে তাকে কুচি কুচি করে কেটে খেয়ে ফেলবে এই ভেবেই সে প্রায় মরো-মরো হয়ে পড়েছে, কাজেই আলো দু-পায়ে ভর দিয়ে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, ধপাস করে বসে পড়ে নতমুখে অশ্রুপাত করতে লাগল, নীরবে।

হাঁহাঁ বললে, হুয়া, দেখিস এ যেন পালায় না।

হুয়া বললে, কোথাকার একটা ছুড়িকে ধরে আনলি রে?

—যেখানকারই হোক, কিন্তু এটা যেন পালাতে না পারে!

—কেন, তুই একে নিয়ে করবি কী? মেরে খাবি?

—না।

—তবে? সংসারে আবার একটা পেট বাড়াবি কেন?

—সে কথা এখুনি নেই বা শুনলি?

—না, আমি শুনবই।

—আমি একে বিয়ে করব?

হাঁহাঁদের মুল্লুকে কেন, সে সময়ে পৃথিবীর সব দেশেই পুরুষরা মোটে একটা বউ নিয়ে খুশি হতে পারত না। এ প্রথা আজও পৃথিবীর বহু দেশেই—এমনকী বাংলাদেশেও বর্তমান আছে। খালি সেকালে পুরুষরা নয় সেকালের মেয়েরাও সময়ে সময়ে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করত। দ্যাখো না, পরে ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠেছে, তখনও দ্রৌপদীর ছিল একটি-দুটি নয়, পাঁচ-পাচটি বর!

কিন্তু কোনও যুগেই কোনও স্বামী যেমন চাইত না যে, তার বউ একসঙ্গে অনেকগুলো বিয়ে করুক, তেমনি সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে শুনলে কোনও স্ত্রীও কোনওদিনই খুশি হতে পারেনি। হুয়াও খুশি হল না।

আলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে হুয়া বললে, এই এক ফোটা মেয়েকে তুই বউ করতে চাস নাকি রে?

— চাই।

—কেন, আমি কি মরেছি?

—তুই এখনও মরিসনি বটে, কিন্তু বেশি কথা কইলে এইবারে মরবি। হাঁহাঁ হাতের মুগুরটা কাঁধের উপরে তুললে। আবার নামিয়ে মাটির উপরে সশব্দে রাখলে।

হুয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। বুঝলে, অত মোটা মুগুরের উপরে যুক্তি বা প্রতিবাদ চলে না। তার মুখ বোবা হয়ে গেল।

হঠাৎ বাহির থেকে টুটুর ব্যস্ত ডাক শোনা গেল—বাবা, বাবা!

—কী রে টুটু!

—হাতি, হাতি!

—কোথায় রে, কোথায়।

—বনের গর্তে! হুঁহুঁদের লোক খবর এনেছে!

হাঁহাঁ তাড়াতাড়ি গুহার কোণ থেকে কতকগুলো বর্শা তুলে নিয়ে বেগে পা চালিয়ে ভিতর থেকে অদৃশ্য হল।

তা ব্যাপারটা হচ্ছে এই সেকালের রোমশ ম্যামথ হাতি ও রোমশ গণ্ডার প্রভৃতি ছিল বিরাট জীব, একালের হাতি গণ্ডারের চেয়ে আকারে অনেক বড়ো। কিন্তু আদিম মানুষদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে বোঝাত কেবল পাথরের বর্শা, কুঠার বা ছুরি-ছোরা এবং লাঠি। এসব দিয়ে তো আর হাতি, গণ্ডার বধ করা চলত না, কাজেই মানুষরা হাতি ও গণ্ডারদের চলাচলের পথে মস্ত মস্ত গর্ত খুঁড়ে তাদের মুখগুলো লতা-পাতা-ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখত। হাতি বা গণ্ডার বুঝতে না পেরে লতা-পাতার আচ্ছাদনের উপরে পা দিলেই হুড়মুড় করে গর্তের ভিতরে পড়ে যেত। তারপর মানুষরা এসে অস্ত্র ও বড়ো বড়ো পাথর ছুঁড়ে পাঠিয়ে দিত তাদের যমালয়ে। এখনও এই উপায়ে জন্তু শিকারের পদ্ধতি আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে লুপ্ত হয়নি।

শিকারের পশু চিরদিনই দুর্লভ—বিশেষত সেই প্রস্তরযুগে। কত কষ্ট করে, কত খোঁজাখুজির পর পাঁচ-সাতদিন অন্তর একটা হরিণ কী শূকর কী ভালুক কী গোরু পাওয়া যায়, একদল লোকের রাক্ষুসে ক্ষুধার মুখে তা উড়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না। তারপর হয়তো দিনকয়েক পুরো বা আধা উপবাস! কারণ আগেই বলেছি, তখন চাষবাস ছিল না, মানুষ আসল খাবার বলতে বুঝত কেবল মাংসই। কাজেই সেকালের জীবন্ত পাহাড়ের মতো একটা ম্যামথ হাতিকে বধ করতে পারলে মানুষ জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করত। অঢেল

মাংস, আকণ্ঠ খেলেও দিন-কয়েকের আগে ফুরোয় না। এবং একথাও আগে বলা হয়েছে, আদিম মানুষদের পচা মাংসেও বিরাগ ছিল না। বরং পচামাংসই তারা বেশি ভালোবাসত। কারণ সদ্য বধ করা পশুর মাংস হত অত্যন্ত শক্ত, খেতে কষ্ট হত। এ যুগের শিকারিরাও হরিণ প্রভৃতি বধ করলে অন্তত একদিন বাসি না করে মাংস খায় না। অতএব বুঝতেই পারছ, সেকালের ম্যামথের মতো প্রকাণ্ড জীবের দেহ অনেক দিন ধরেই তুলে রেখে দেওয়া হত।

কাজেই হাঁহাঁ আলোর কথা ভুলে বেগে বেরিয়ে গেল। বউ যতখুশি পাওয়া যায়, কিন্তু একটা ম্যামথের দাম দশ-বিশটা বউয়ের চেয়ে বেশি। প্রস্তরযুগের যুক্তি ছিল এইরকম।

হুয়া খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোকে দেখলে। তারপর এগিয়ে গিয়ে আলোর খোপাটা একবার টেনে কৌতুহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, এটা কী রে?

আলো তাদের ভাষা জানে না, কিছু বুঝতে পারলে না। একবার মুখ তুলে হুয়াকে দেখেই অস্ফুট আর্তনাদ করে আবার মুখ নামিয়ে ফেললে। হুয়া নারী হলেও তার কোনও সান্ত্বনার কারণ নেই। রাক্ষসের বদলে রাক্ষসী, এইমাত্র!

হুয়া আরও অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলে, তোর গায়ে লোম নেই কেন? তুই এত রোগা কেন? তুই কাঁদছিস কেন? প্রভৃতি.....

কিন্তু আলো কথা কয় না। তারপর হুয়া অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে কী ভাবলে। খুব সম্ভব, সতীনের সঙ্গে ঘর করতে গেলে ভবিষ্যতে তাদের সংসার কী আকার ধারণ করবে, সেইটেই কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করলে। দৃশ্যটা বোধকরি খুব উজ্জ্বল বলে মনে হল না। একবার উঠে বাইরে গেল। সেখানে কেউ নেই, তার ছোটো খোকাটা পর্যন্ত ম্যামথ বধের ঘটা দেখতে গেছে।

পাহাড়ের উপরে পড়ন্ত রোদে গাছের ছায়াগুলো সুদীর্ঘ হয়ে উঠছে। হুয়া বুঝলে, আলো নেবাবার আগেই সকলে আবার গুহায় ফিরে আসবে।

সে আবার ভিতরে এল। আলোর কাছে এসে বললে, এই ছুড়িটা!

সাড়া নেই। আলোর হাত ধরে এক টানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুয়া বললে, আ মর! তুই বোবা নাকি রে?

আলো শুধু কাঁদে। আবার তার হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে হুয়া গুহার বাইরে এল। তারপর তাকে একটা বিষম ধাক্কা মেরে পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রুক্ষ স্বরে বললে, দূর হ বোবা আপদটা! বেরো!

আলো তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলে, কিন্তু নিজের এই কল্পনাতীত সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারলে না। ভাবলে, এ হচ্ছে রাক্ষসীর ছলনা! সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

পাহাড়ের উপর থেকে একটা লম্বা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে মাথার উপরে তুলে নাড়তে নাড়তে হুয়া দু-চোখ পাকিয়ে বললে, আমার বরকে ভারী পছন্দ হয়েছে, না? মেরে না তাড়ালে বিদায় হবি না?

যদিও আলো এখান থেকে পালাতে পারলেই হাতে স্বর্গ পায়, তবু পালাবার জন্যে নয়, হুয়ার লাঠি এড়াবার জন্যেই ভয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

হুয়া চেঁচিয়ে বললে, দূর হরে সতীন, দূর হ! তোকে আমার বর দেব না রে! সে জানে, হাঁহাঁ যখন আজ হাতি পেয়েছে, খুশিতে মশগুল হয়ে ফিরে আসবে! মেয়েটা পালিয়েছে শুনলেও বেশি গোলমাল করবে না, খাওয়াদাওয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে। পেট আগে না বউ আগে? বড়োজোর হুয়ার পিঠে পড়বে লাঠির দু-চার ঘা, তা সতীনকে বিদায় করতে পারলে লাঠির গুতোও সে হজম করতে রাজি! লাঠির ব্যথা সারতে লাগে দুদিন, কিন্তু সতীন ঘাড়ে চেপে থাকে চিরদিন।

আলো যখন তার চোখের আড়ালে গেল, হুয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেইখানেই বসে পড়ল দুই পা ছড়িয়ে। তার সারা মন আনন্দে পরিপূর্ণ। সে গান জানলে নিশ্চয়ই এখন একটা গান ধরত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুয়াদের সময়ে গান-বাঁধিয়ে কবিরা ছিল না।

হুয়াকে তোমরা একবার ভালো করে দেখে নাও। তার সঙ্গে এই আমাদের শেষ দেখা।

কিন্তু সত্যিকথা বলতে কী, সেই প্রস্তরযুগ থেকে এই বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওই হুয়া। আজ সে ব্লাউজ, রেশমি শাড়ি, গহনা, হাই হিল জুতো পরে, রকমারি কায়দায় সুবাসিত চিকন চুল বাঁধে ও হাতে-গলায় মুখে-ঠোঁটে স্নো' আর 'পাউডার' আর রং মাখে এবং মিহি সুরে মাজা ভাষায় কথা কয় বলে তোমরা আর হাঁহাঁর বউ হুয়াকে চিনতে পারো না। হুয়ার প্রস্তরযুগে লীলাখেলার ইতিহাস সাঙ্গ করলুম বটে, কিন্তু আজও সে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে। খালি হুয়া নয়, হাঁহাঁও। একটু তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেই সবাই তাদের চিনতে পারবে।

ফুসমন্তরের চিৎকার

এইবার আলোর কাছে যাই। হুয়ার লাঠি এড়াবার জন্যে প্রথমে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল, তারপর একেবারে পাহাড়ের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখলে।

অনেক দূরে গুহামুখে হুয়া পা ছড়িয়ে বসে আছে—এত দূরে যে, তাকে দেখাচ্ছে খুব ছোট্টটি। সে তার পিছনে তেড়ে আসেনি দেখে আলো ভারী অবাক হয়ে গেল। তাহলে রাক্ষসীর মনেও দয়া-মায়া আছে।

কী বিষম বিপদ যে সে এড়িয়ে এসেছে এবং হুয়া যে কেন তাকে এত সহজে মুক্তি দিলে তা জানতে পারলে আলো নিশ্চয়ই মত-পরিবর্তন করত।

কিন্তু আলোর তখন রাক্ষসীর দয়া-মায়ার কথাও ভাববার সময় ছিল না। সূর্য পালিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে। এরই মধ্যে অরণ্যের তলায় বিরাট অন্ধকার-সভায় আয়োজন হচ্ছে। নীচে সুদূর প্রান্তরে মোষ ও গোরুর দল রাত্রের আশ্রয়ের সন্ধানে দলে দলে ফিরে আসছে। পাখিরা সাঁঝের গান শুরু করলে বলে। আদিমযুগের ভয়াবহ রাত্রে মানুষের পক্ষে বাইরে থাকা অসম্ভব।

কিন্তু আলো কোনদিকে যাবে? কোথায় সেই নদীর তীর, যেখানে তার বাবা তাঁবুর ভিতর বসে মেয়ের শোকে হাহাকার করছেন?

হ্যাঁ, বাবা যে তার জন্যে কাঁদছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই-বাবা তাকে কত ভালোবাসেন! কিন্তু আলো কেমন করে তার কাছে গিয়ে বলবে—বাবা, এই তো আমি ফিরে এসেছি, আর কেঁদো না! সে যে পথ চেনে না! এ দেশ যে নতুন।

কিন্তু পথ চিনুক আর না চিনুক আলোকে আগে এই রাক্ষসপুরীর কাছ থেকে দূরে— অনেক দূরে পালাতে হবে! বাবার কাছে ফিরতে না পারা খুব দুঃখের কথা, কিন্তু অসম্ভব দুঃখের কথা হচ্ছে, আবার রাক্ষসের হাতে পড়া!

অতএব আলো তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামতে লাগল। এ অভিশপ্ত মুল্লুক থেকে যত তফাতে যাওয়া যায় ততই ভালো।

পাহাড় থেকে নেমে সে দেখলে, বাঁ দিকে খানিক দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ হয়েছে, ডান দিকে একটা নোড়া-নুড়ি-ছড়ানো শুকনো নদীর গর্ভ, শীতকালে যা পরিণত হয়েছে চলন-পথে এবং সামনের দিকে বনজঙ্গল ও ছোটো ছোটো চিবি-ঢাবা ও বাচ্ছা পাহাড়। কিন্তু কোনদিকে তাদের আস্তানা? তার পক্ষে যে সবদিকই সমান!

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, ডান দিকের মরা নদীর সাদা বালির পটে মূর্তিমান অভিশাপের মতন একটা কালো ছায়া! মস্ত এক নেকড়ে বাঘ ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই পানে! আলো আর দাঁড়াল না, দ্রুতপদে ছুটল সুমুখের পথ বা বিপথ ধরে। কিন্তু সেখান দিয়ে কী তাড়াতাড়ি চলবার উপায় আছে? পায়ে কাটা বেঁধে, চারিদিকে ছড়ানো নুড়ি-নোড়াতে ঠোক্কর খেতে হয়, এখানে ঝোপ, ওখানে নালা, পথের উপরে ওই ঝুপসি গাছটা কেমন সন্দেহজনক, ওর একটা ডাল জড়িয়ে কালোপান কী একটা যেন দেখা যাচ্ছে, প্রকাণ্ড অজগর হওয়াই সম্ভব, ওর তলা দিয়ে এগুনো হবে না, আবার ঘুরে যেতে হবে!

হাঁহাঁদের চেয়ে সবদিকেই ঢের বেশি সভ্য হলেও, আলোরাও হচ্ছে বনের মানুষ। সেদিনের মানুষ একটু একটু করে সমাজবদ্ধ জীবে বা জাতিতে পরিণত হচ্ছে বটে, কিন্তু তখনও পৃথিবীতে প্রথম নগরের প্রতিষ্ঠা হয়নি। অনেক তফাতে তফাতে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে জনকয় করে মানুষ নদীর ধারে একটুখানি খোলা জায়গা বেছে নিয়ে বাস করত এবং তাদের সেইসব বসতিকে যদি 'গ্রাম' নাম দেওয়া যায় তাহলে তাদেরও ডাকতে হয় চলন্ত গ্রাম বলে। কারণ শিকারের পশুর সঙ্গে সঙ্গে সেইসব গ্রামকে চলাফেরা করতে হত ইতস্তত! অর্থাৎ এক বনে শিকারের অভাব হলেই মানুষদের বাসা তুলে নিয়ে যেতে হত অন্য বনে। যেদিন থেকে সে চাষবাস করতে শিখলে মানুষ স্থায়ী বাসা গড়লে সেই দিন থেকেই।

কারণ খেতের ফসল ফলে তার নিজের পরিশ্রমে এবং খেত এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় পালায় না। তাই নগর পত্তনের মূল হচ্ছে কৃষিকার্যই। কিন্তু সেদিন আসতে তখনও অনেক দেরি।

আলো জ্ঞান হয়েই দেখেছিল, নিজেদের চারিপাশে গহনবনের শ্যামল রহস্য,--নদীর মতো, ঝরনার মতো, জন্ম তার নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যেই। কাজেই জলের মাছের ডাঙায় উঠে যে দুর্দশা হয়, কিংবা আধুনিক কলকাতা শহরের মিস ইভা বসুকে সুন্দরবনে ছেড়ে দিয়ে এলে তার যে দুরবস্থা হয়, আলোর সেরকম কোনও মুশকিল হবার কারণ ছিল না।

কিন্তু অরণ্যের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিভীষিকা তাকে এড়াতে পারে কে? সে বিভীষিকা বনবালা বলে তো আলোকেও ক্ষমা করবে না! বরং বনবালা বলেই আলো ভালো করেই জানে যে, এই বন্ধুহীন নিবিড় অরণ্যে রাত্রি কী ভয়ঙ্করী! চামুণ্ডার যদি কোনও রূপ থাকে তবে সে হচ্ছে আদিমযুগের বনবাসিনী ঘোরা নিশীথিনী!

এখনও রাত আসেনি, বেলাশেষের স্নান আলোমাখা আকাশের দিকে দিকে ছায়াময়ী সন্ধ্যা সবে তার ধূসর অঞ্চল ছড়িয়ে দিচ্ছে, এরইমধ্যে দেখা গেল, একটা জঙ্গলের গর্ভ ভেদ করে হেলে দুলে বেরিয়ে এল জ্যান্ত কেল্লার মতো সেকালের বিরাটদেহ রোমশ গণ্ডার! আলো তরের মতো একটা বড়ো গাছতলায় দৌড় দিলে, দরকার হলে গাছে উঠে গণ্ডারকে ফাঁকি দেবে বলে। কিন্তু সে আলোকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, নিজের মনে সেইখানেই বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

গণ্ডারকে পিছনে রেখে আলো অন্য দিকে এগুতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার সর্বশরীর গেল যেন হিম হয়ে! এ যে গণ্ডারের চেয়েও সাংঘাতিক!

খানিক দূরে একটা সবুজ গাছপালার প্রাচীর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একদল রাক্ষস! হাঁহাঁরা ম্যামথের মাংস নিয়ে ফিরে আসছে! তাদের দলে প্রায় পনেরো-ষোলোজন লোক এবং প্রত্যেকেই বহন করে আনছে ম্যামথের খণ্ডবিখণ্ড দেহের এক একটা অংশ। আলোর চোখে একেই তো তারা মূর্তিমান রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই নয়, তার উপরে তাদের সর্বাঙ্গ ম্যামথের রক্তে হয়ে উঠেছে বীভৎস! মুখে-মাথায়-গায়ে লম্বা লম্বা ছেড়া লোম, মাংস ও হাড়ের কুচি! দেখলে শিউরে উঠতে হয়!

হাঁহাঁও আলোকে দেখতে পেয়েছিল। এখানে তাকে দেখবার আশা মোটেই সে করেনি, তাই প্রথমে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মহাক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

আলো পালাবে কী, সেই প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনেই কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

হাঁহাঁ দাঁত কিড়মিড় করে বললে, টুটু, তোর মায়ের আক্কেল দেখছিস রে?

—কেন, মা কী করলে রে বাপ?

—ছুড়িটাকে পালাতে দিয়েছে!

—যে পালাতে চায়, তাকে ধরে রাখে কে রে?

— আচ্ছা, ধরে রাখা যায় কি না বাসায় গিয়ে বুঝিয়ে দেব। এখন শোন।

—বলো বাপ!

—'ছুড়িটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চল! তোর হাতির ঠ্যাংখানা আমার কাঁধে চাপিয়ে দে। টুটু যেরকমভাবে হাতির পা বাপের জিম্মায় দিয়ে আলোর দেহের দিকে এগিয়ে চলল তা দেখলে মনে হয়, এই আপদটাকে ঘাড়ে করে বয়ে গুহায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার মোটেই নেই। কিন্তু এ হচ্ছে প্রস্তরযুগের কথা। অবাধ্য হলে বাপ তখন ডান্ডা মেরে পুত্রবধ করতেও পিছপা হত না। আবার বুড়ো ও অথর্ব হলে ছেলেও বাপকে দেখত অকেজো উপদ্রবের মতো—যে ছেলের

পরিশ্রমে আনা খোরাকে পুরো ভাগ নেবে, অথচ পরিবর্তে কিছু দেবে না। ছেলে তখন অলস ও সংসারের পক্ষে অনাবশ্যক বুড়ো বাপকে খুন করে পিতৃদায় থেকে নিস্তার পেত সহজেই। এযুগে তোমাদের হয়তো এসব কথা শুনলে চমক লাগবে। ভাববে, সেকালে বুঝি পিতৃস্নেহ বা পুত্রস্নেহ বা মায়া-দয়া কিছুই ছিল না! ছিল। কিন্তু তখনকার স্নেহদয়া-মায়া ছিল সেযুগেরই উপযোগী। কারণ সকলের উপরে কাজ করত তখন জঙ্গলের পাশবিক আইন-কানুন। জীবতত্ত্ববিদদের মতে, মানুষও পশুশ্রেণীভুক্ত। তবে সে অসাধারণ পশু—কারণ উচ্চস্তরের মস্তিষ্কের অধিকারী। বহুযুগব্যাপী মস্তিষ্ক চর্চার ফলে আজ সে যদি সাধারণ পশুর চেয়ে দশধাপ উঁচুতে উঠে থাকে, তবে আদিমযুগে ছিল মাত্র এক ধাপ উঁচুতে। কাজেই প্রায়ই পশুধর্মপালন করত। আজও জঙ্গলের আইন একটুও বদলায়নি। হাতি, গণ্ডার, সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি বৃদ্ধ ও অক্ষম হলে আজও দল থেকে পরিত্যক্ত বা জোয়ান পশুদের দ্বারা নিহত হয়। এবং আধুনিক যুগেও কোনও কোনও বন্য মানুষদের সমাজে বৃদ্ধদের হত্যা করবার প্রথাও প্রচলিত আছে।......

বাপের হুকুম টুটু অমান্য করতে সাহস করলে না— হাঁহাঁ জোরসে লাঠি হাঁকড়াবার শক্তি আজও হারায়নি এবং তার শক্তির উপরে টুটুর শ্রদ্ধার মাত্রা আজও কমেনি!

এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটল।

খোলা জমির মাঝখানে পড়েছিল আলোর অচেতন দেহ। তার চারিধারেই অরণ্যের প্রাচীর, তারও পরে দূরে ও কাছে এখানে-ওখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো ধূসর বা শ্যামল শৈল—তাদের শিখরে শিখরে মাখানো মরন্ত দিবসের নিবন্ত দীপ্তি।

পশ্চিম দিকে ছিল হাঁহাঁর দল। টুটু সেইদিক থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, এমন সময়ে পূর্ব দিকের অরণ্যের ভিতর থেকে বেগে বেরিয়ে আসতে লাগল লোকের পর লোক।

তারা নতুন মানুষ! সবাই যখন আত্মপ্রকাশ করলে তখন দেখা গেল, দলটি বড়ো মন্দ নয়। কারণ সংখ্যায় তারা ত্রিশ-বত্রিশ জনের কম হবে না। প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

টুটু আর অগ্রসর হল না, সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাঁহাঁও চমকে উঠে ফ্যাল-ফাল করে তাকিয়ে রইল। হুঁহুঁ বললে, সর্দার, পালাই চল রে!

হাঁহাঁর চমক ভাঙল। বললে, পালাব কেন?

—দেখছিস না, দলে ওরা ভারী?

—কিন্তু ওগুলো তো পোকার মতো! আমাদের চড় খেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

—কিন্তু আমরা চড় মারবার আগেই ওরা যে অস্তর ছুড়বে রে! হঠাৎ নতুন মানুষদের একজন শিঙা বার করে ফুঁয়ের পরে ফুঁ দিয়ে বন-পাহাড়ের চতুর্দিক করে তুললে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। পরমুহুর্তে সেই মহারণ্যের চারিদিক আরও বহু শিঙার ভোঁ-ভোঁ রবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! সূর্যসর্দারের লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে অরণ্যের নানাদিকে আলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কথা ছিল, যে দল আলোকে প্রথম খুঁজে পাবে শিঙার সঙ্কেতে আর সবাইকে সে খবর জানিয়ে দেবে এবং তাহলেই সকলে একত্রে এসে মিলবে। শিঙা যে কী চিজ, হাঁহাঁরা কেউ তা জানে না! হাঁহাঁ চকিত স্বরে বললে, অমন ভয়ানক চ্যাঁচায় কোন জানোয়ার রে?

হুঁহুঁ ভয়ে ভয়ে বললে, জানোয়ার নয় রে সর্দার, জানোয়ার নয়—ফুসমন্তর! বনের চারিধারেই ফুসমন্তর চ্যাঁচাচ্ছে! ওই শোন, আবার কাদের পায়ের শব্দ।

সত্যিই তাই! মাটির উপরে পায়ের শব্দ জাগিয়ে দলে দলে কারা যেন বেগে ছুটে আসছে! হুঁহুঁ বললে, আমি লম্বা দিলুম রে সর্দার ফুসমন্তরের সঙ্গে লড়তে পারব না! কেবল হুঁহুঁই নয়, টুঁটুঁ, টুটু ও ঘটুর সঙ্গে আর আর সকলেও যখন পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে, হাঁহাঁরও তখন পালানো ছাড়া উপায়ান্তর রইল না।

যুদ্ধের আয়োজন

পরদিনের প্রথম সূর্যকরের সোনালি ছোয়া পেয়ে জেগে উঠল আদিম প্রভাত, জেগে উঠল বনবিহঙ্গের দল।

আর জেগে উঠল ম্যামথ হাতি, রোমশ গণ্ডার, বল্লা হরিণ, দেতো বরাহ, বুনো ঘোড়া, শৃঙ্গী মোষ ও গোরু এবং বুনো ঘোড়া প্রভৃতির দল। আলো দেখে ঘুমোতে গেল কেবল খাঁড়াদেঁতো, গুহা ভালুক, হায়েনা ও নেকড়ে প্রভৃতি, রাতের আঁধার না জমলে যাদের শিকারের সুবিধা হয় না।

মানুষরাও জাগল বটে, কিন্তু তারা জাগল কি না তা দেখবার জন্যে কারুরই ছিল না আগ্রহ। বিপুল পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আজ জেগে উঠে এত বেশি গোলমাল করে যে, লোকালয়ের অনেক দূরে থেকে অরণ্যও তা শুনতে পায়। সুন্দরবনেও আজ বাঘের চেয়ে মানুষের সংখ্যাই বেশি বোধহয়।

কিন্তু সেদিনকার অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষের সংখ্যা ছিল কত কম! যে দেশে জন্তু থাকত একলক্ষ, সেখানে একশো জন মানুষও থাকত কি না সন্দেহ! কাজেই মানুষরা জেগে উঠলেও অন্যান্য জীবরা এমন চিৎকার করত যে মানুষের জাগ্রত কণ্ঠস্বর শোনাই যেত না— যেমন ছোটো নদীর কলধ্বনি ডুবে যায় সাগরগর্জনের মধ্যে!

কিন্তু কী করে যে ছোটো নদী শেষটা অনন্ত সাগরকেও হার মানলে, সে এক বিচিত্র ইতিহাস! জীবজন্তুর সংখ্যাধিক্য দেখেই হয়তো মানুষ প্রথমে দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ হিংস্র জন্তুই ছিল মানুষের চেয়ে বলবান। একা মানুষ তাদের কারুর সামনেই দাঁড়াতে পারত না। হিসাব করে দেখা গেছে, নিয়ানডের্টাল অর্থাৎ হাঁহাঁদের জাতের অধিকাংশ মানুষই তখন বিশ বছর বয়স হবার আগেই মারা পড়ত। শতকরা পাঁচ-ছয়জনের বেশি মানুষ পঞ্চাশ বছরে গিয়ে পৌছোতে পারত না! মানুষ দীর্ঘজীবী হতে পেরেছে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ

আধুনিক যুগেই। আদিমকালে মানুষরা কেবল নিজেদের মধ্যেই সর্বদা মারামারি করে মরত না, তাদের অধিকাংশকেই খাদ্যরূপে বা শত্রুরূপে গ্রহণ করত হিংস্র পশুর দল! কাজেই মানুষ তখন আত্মরক্ষার জন্যে অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে ভাব করে দল বাঁধতে লাগল। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জীবদের মগজে আজও এ বুদ্ধি ঢোকেনি, একা (বা বড়োজের আরও দু-একটা জীব মিলে) দলবদ্ধ মানুষদের আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে বসে। দল বেঁধে মানুষ তার উচ্চতর মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছে। পরে এই দল থেকেই হল সমাজের সৃষ্টি। আমরা যে নতুন মানুষদের দেখিয়েছি, তাদের ভিতরে ধীরে ধীরে সমাজ গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু হাঁহাঁদের জাতের বা নিয়ানডের্টাল'-শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মধ্যে সমাজের অস্তিত্বই ছিল না। সাধারণ স্বার্থের বা আত্মরক্ষার জন্যে বা ভয়ের দায়ে মাঝে মাঝে বড়োজোর তারা দলবদ্ধ হতে পারত। ধরো, হাঁহাঁ অগ্নি আবিষ্কার করলে দৈব-গতিকে, কিন্তু তার গুপ্তকথা নিজের ছেলেকেও জানাতে রাজি নয়। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব হলে হয়তো সে এমন লুকোচুরি করত না, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকেই বেশি বড়ো বলে মনে করত। নতুন মানুষরা ব্যক্তির উপরে স্থান দিত সমাজকে। একজন নতুন কিছু আবিষ্কার করলে সেটা সমস্ত সমাজেরই নিজস্ব হত। নতুন কোনও সমস্যায় পড়লে সমাজের সকলে মিলে করত তার সমাধান। তাই একতায় ও সমষ্টিগত শক্তিতে তারা ছিল হাঁহাঁদের চেয়ে ঢের বেশি উন্নত। হাঁহাঁরা ব্যক্তিগত শক্তিতে নতুন মানুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও প্রতি পদেই তাই তাদের কাছে ঠকে যেতে লাগল।

পরদিনের প্রভাতের কথা বলছিলুম। তোমরা সবাই দেখেছ, প্রভাত হয় কেমন শান্ত ও সুন্দর। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে জাগে পাখিরা, কিন্তু তারা জাগলেও সৌম্য প্রভাতের শান্তি ও সৌন্দর্যকে করে তোলেনা কদর্য। প্রভাতকালের মধ্যে তপোবনের একটি যে ভাব আছে, মানুষ জেগে উঠেই তা নষ্ট করে দেয়।

প্রস্তরযুগের সেই প্রভাতকেও আদিম মানুষ আজ বিশ্রী করে তুলেছে। আকাশের নীলসায়রে সোনার পদ্মের মতন চমৎকার সূর্য জেগে উঠেই দেখলে, কতদিনকার বিজন বন ধ্বনিত হয়ে উঠছে মানুষদের বিকট চিৎকারে! মার্জিত, দুর্বল কণ্ঠের অধিকারী আধুনিক শহুরে মানুষ আমরা, ম্যামথ-বিজয়ী আদিম বন্য মানবতার সেই গগনভেদী কোলাহলের বিকটতা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ নয়।

সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, বনের অলিগলি দিয়ে, মাঠ প্রান্তরের উপর দিয়ে, পাহাড়ের পর পাহাড়ের উপত্যকা ও চড়াই-উৎরাই পার হয়ে দলে দলে বিরাটবক্ষ, হৃষ্টপুষ্ট, মসিকৃষ্ণ মানুষ চলেছে, পশু-শক্তির উচ্ছাসে লাফাতে লাফাতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে! অরণ্যের জীবরা যেদিকে পারলে ছুটে পালাতে লাগল— এ অঞ্চলে এমন বিষম চিৎকারপাগল বৃহৎ জনতা আর কখনও দেখেনি তারা! মানুষদের কোনওদিনই তারা বন্ধুর মতে দেখেনি, তাই তারা সহজে ভেবে নিলে যে, এরা ছুটে আসছে তাদেরই জব্দ করতে বা বিপদে ফেলতে!

হাঁহা-সর্দার এ অঞ্চলে তার যত জাতভাই আছে সবাইকে জোরে ডাক দিয়েছে! কিছুদিন আগে হলে হাঁহাঁ-সর্দার এমন বেপরোয়া হুকুম জারি করতে সাহস করত না, কারণ সে জানত কেউ তার হুকুম মানবে না, উলটে হয়তো তাকেই তেড়ে মারতে আসবে! কিন্তু আজ সে যে সর্দার—যে সে সর্দার নয়, অগ্নিবিজয়ী হাঁহাঁ-সর্দার হাতে যার দপদপে খোকা-আগুন, খাঁড়াদেঁতো আর গুহাভালুকের দল যার প্রতাপে দেশছাড়া, তার কথা আজ শুনবে না কে? তাকে আজ ভয় করবে না কে?

অতএব জনতার পর জনতার স্রোত বয়েছে বনে বনে—যেন সুন্দর শ্যামলতার উপরে কুৎসিত কালির ধারা! কিন্তু সব স্রোতের গতি এক মুখেই! সবাই চলেছে হাঁহাঁ-সর্দারের গুহার দিকেই। অসভ্যের জনতা, তারা মৌনব্রত কাকে বলে জানে না, তাদের চিৎকারে পৃথিবী তাই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

হাঁহাঁ-সর্দার বড়ো চালাক। সে জানে, আজ এই বিপুল জনতার প্রত্যেক্যের হাতেই দিতে হবে অমোঘ অগ্নি-অস্ত্র এবং তাকে অগ্নি সৃষ্টি করতে হবে গোপনে, সকলের অগোচরেই। তাই আজ সে খুব ভোরে উঠে টুটু আর ঘটুকে নিয়ে নতুন মানুষদের আস্তানার অনতিদূরে, কলকল নদীর তীরবর্তী এক পাহাড়ের উপরে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করে এসেছে। এর পর তার সঙ্গীরা শুকনো গাছের ডাল ভেঙে কুণ্ডের আগুনে জ্বলিয়ে অনায়াসেই শত্রুবধ করতে পারবে! তোমরা বুঝতেই পারছ, হাঁহাঁ-সর্দারের শত্রু কে? তারা কেবল আলোকেই কেড়ে নিয়ে যায়নি, ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর শুনিয়ে সকলের সামনে তার মহিমাকে করে দিয়েছে অত্যন্ত খর্ব। যে ফুসমন্তরের জন্যে আজ তার এমন দেশজোড়া মানসম্ভ্রম, ওদের ভো-ভো ফুসমন্তর তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠলে তাকে কি এখানে কেউ মানবে? অতএব সে সকলকে দেখাতে চায়, দুনিয়ায় তার নিজস্ব ফুসমন্তরের তুলনা নেই!

সেই সুবৃহৎ জনতা যখন তার পাহাড়ের তলায় এসে জমল, হাঁহাঁ-সর্দার তখন একটা উঁচু পাথুরে ঢিপির উপরে দাঁড়াল বিচিত্র ভঙ্গিতে!

হ্যাঁ, তাকে আজ খুব জমকালো দেখাচ্ছে বটে! সে কোমরে পরেছে গুহাভালুকের একখানা ছাল এবং গায়ে জড়িয়েছে খাঁড়াদেঁতোর ছাল। সর্দার গৌরব প্রকাশ করবার জন্যে তার মাথায় রয়েছে রঙিন পাখির পালকের টুপি! কটিদেশে গোঁজা পাথরের ছোরা, পিঠে বাধা দুটো বর্শা এবং তার দুই হাতে আছে দুখানা দাউ-দাউ করে জ্বলন্ত কাঠ! কেবল গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে কেউ সর্দার বা দলপতির পুরো সম্মান আদায় করতে পারে না। প্রস্তরযুগের আদিম মানুষ হলেও হাঁহাঁ বুঝে নিয়েছিল, সর্দারির সম্মান অটুট রাখবার জন্যে অভিনয়েরও খানিকটা দরকার হয়—নইলে লোকে উচিত মতো অভিভূত হয় না। আর অভিনয় করতে গেলে ‘মেকআপ’-এর সাহায্য না নিলে চলবে কেন?

মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে হাঁহাঁ-সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, ওরে, তোদের কেন ডাক পড়েছে, সবাই তা জানিস তো?

জনতা সমস্বরে বললে, জানি রে সর্দার।

অগ্নিময় কাঠ দুখানা শূন্যে তুলে বারংবার নড়তে নাড়তে হাঁহাঁ বললে, আমাদের মুলুকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায় কোথাকার একদল পোকার মতন মানুষ। আমরা হচ্ছি আগুনঠাকুরের চ্যালা, দুনিয়ার কাউকে ভয় করা কি আমাদের উচিত?

জনতা একস্বরে বললে, না রে সর্দার, না!

হুঁহুঁর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করে হাঁহাঁ বললে, কিন্তু কী এক বাজে ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর শুনে আমাদের ওই হামবড়া হোঁদল-কুতকুতে হুঁহুঁটা ভয়ে একেবারে খাবি খাচ্ছে রে! সবাই কটমট করে হুঁহুঁর দিকে তাকালে। সে মুষড়ে পড়ে ঘাড় হেট করে বললে, "আমি আজ দেখাতে চাই আমার খোকা-আগুনের সামনে পৃথিবীর কোনও ফুসমন্তরই টিকতে পারে না। চল রে তোরা আমার সঙ্গে সেই মানুষ-পোকাগুলোর আড্ডায়! আমরা তাদের ধরব আর মারব।

জনতা বললে আর পুড়িয়ে খেয়ে ফেলব!

হাঁহাঁ ফিরে বললে, হুঁহুঁ রে, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি কি যাবি না?

হুঁহুঁ বুদ্ধিমানের মতো বললে, তোকে যখন সর্দার বলে মানি, তোর হুকুমে প্রাণ দিতেও রাজি আছি রে। কিন্তু মনে মনে এই অভিযানে যাবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না।

হাঁহাঁ আবার চেঁচিয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বললে, তোদের জন্যে কল-কল নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর আমি আগুন-দেবতাকে জাগিয়ে এসেছি রে! আর দেরি নয়, আয় তোরা?

নরহত্যা ও রক্তনদীতে স্নান করবার এমন মহাসুযোগ পেয়ে সেই বিরাট জনতা ভীষণ আনন্দে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল এবং বারংবার চিৎকার করে বলতে লাগল, জয় জয়, হাঁহাঁ-সর্দারের জয়!

এই সভ্য যুগেও মানুষ নরহত্যার সেই বিকট আনন্দ ভুলতে রাজি নয়, নব নব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করে পৃথিবীর সবুজ বুক সাদা করে দেয় লক্ষ লক্ষ নরকঙ্কালের শয্যা পেতে! হাঁহাঁদের তাণ্ডব-নাচ আর জয়জয়কার আজও জেগে আছে মানুষের কর্মক্ষেত্রে।

কল-কল নদীর সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা তটরেখার পাশ দিয়ে অগ্রসর হল সেই উন্মত্ত জনস্রোত। সর্বাগ্রে চলেছে হাঁহাঁ-সর্দার। দুই হস্তে তার অগ্নির নৃত্য!

যুদ্ধ

কল-কল নীদর তীরে আজ প্রভাতের রবিকর নতুন মানুষদের সভাকেও করে তুলেছে সমুজ্জ্বল।

নদীতটের বালুরেখার উপরেই যে উচ্চভূমিতে খাটানো হয়েছিল তাদের তাবু, তারই একটা অংশ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে। এবং সেইখানে মণ্ডলাকারে আসন গ্রহণ করেছে আদিম পৃথিবীর নবযুগের শিকারি যোদ্ধারা। প্রত্যেকেরই সাজ-পোশাকে আজ একটু বিশেষ মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

সে ছিল এমন যুগ, তখন সশস্ত্র থাকতে হত প্রত্যেককেই। যোদ্ধাদের সকলেরই কাছে রয়েছে ধনুক-বাণ, মুগুর, ছোরা, বর্শা কিংবা কুঠার। অরণ্যে তাদের বাস, কখন কোনও দিক থেকে মানুষ-শত্রু বা হিংস্রজন্তু আক্রমণ করে বলা যায় না, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। আহারে বিহারে শয়নে সর্বদাই অজ্ঞাত সব বিপদের হঠাৎ আবির্ভাবের সম্ভাবনা! এরও ঢের পরের যুগেও এই প্রথা লুপ্ত হয়নি, তখনও জামাই যেত শ্বশুরবাড়িতে তরোয়াল হাতে নিয়ে! আজও শিখ আর গুর্খারা সবসময়েই অস্ত্র কাছে রাখে।

যোদ্ধারা যেখানে মণ্ডলাকারে বসে আছে, তার একদিকে রয়েছে একখানা উঁচু পাথর,— সর্দারের আসনরূপে যা ব্যবহৃত হবে। সর্দারের জন্যে উচ্চাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচীন যুগ থেকেই। সেই উচ্চাসনই পরে পরিণত হয় রত্নখচিত স্বর্ণ বা রৌপ্য সিংহাসনে।

প্রত্যেক যোদ্ধার মুখ দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না, আজ তারা এখানে সমবেত হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ বা শিকারের জন্যে নয়, কোনও বিশেষ উৎসবের জন্যে। কারণ প্রত্যেকেরই হাসি হাসি মুখ—কেউ গল্প করছে, কেউ গান গাইছে, কেউ তালে তালে করতালি দিচ্ছে।

এমন সময়ে দেখা গেল, ডান হাতে আলোর কোমর জড়িয়ে তাবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন সূর্য-সর্দার—প্রশান্ত মুখে শান্ত হাসির লীলা। আলোর মুখও হাসি-খুশিতে মনোরম। সূর্য-সর্দার এসে উঁচু পাথরখানির উপরে বসলেন। আলো বসল বাপের পাশে মাটির উপরে, তার জানুর উপরে হেলে মাথা রেখে। একালে রাজকুমারী বা সর্দার-কন্যার জন্যেও বিশেষ আসনের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু তখন সর্দারের ছেলেমেয়েদের জন্যে কেউ মাথা ঘামাত না। সূর্য-সর্দার ধীরে ধীরে বললেন, বন্ধুগণ, তোমরা জানো, রাক্ষসদের কবল থেকে আমার আদরের মেয়ে আলো উদ্ধার পেয়েছে বলে আজ আমি দেবতাদের কাছে জীব বলি দেব। শুভকার্যে দেরি করা উচিত নয়, তোমরা বলির পশু নিয়ে এসো।

তখনই একজন লোক উঠে প্রকাণ্ড দামামা বাজিয়ে বলির পশু আনবার জন্যে সঙ্কেত করলে।

তারপরেই দেখা গেল, কয়েকজন লোক মস্তবড়ো একটা ভালুককে টেনে হিঁচড়ে সভার দিকে আনছে। ভালুকের চার পায়ে চারগাছা চামড়ার দড়ি বাঁধা, চারজন লোক চারদিক থেকে দড়িগুলো টেনে আছে! তার কোমরে ও গলাতেও চামড়ার দড়ি বেঁধে ধরে আছে আরও দুজন লোক। ভালুক ভীষণ গর্জন করছে, দাঁত খিচোচ্ছে, নখ-বার-করা থাবা ছুঁড়ছে এবং অগ্রসর হতে চাইছে না, কিন্তু তার সমস্ত আপত্তি ও ভয় দেখাবার চেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে। ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মানুষের হাতে জাতভাইয়ের এই অবস্থা দেখলে তোমাদের পূর্ব-পরিচিত গুহাভালুক তার কান-কাটা বইয়ের কাছে কী মত প্রকাশ করত বলো দেখি?

তোমরা মোষ, ছাগল বলি দেওয়ার কথা শুনেছ, হয়তো সাঁওতালদের মুরগি বলি দেওয়ারও কথা তোমাদের অজানা নেই এবং এও জানো, আগে নরবলিও দেওয়া হত। কিন্তু ভালুক-বলির কথা এই বোধকরি প্রথম শুনলে? কিন্তু আদিম যুগে পৃথিবীর নানা দেশেই যে ভালুক বলি দেওয়া হত, এর বহু

প্রমাণ পাওয়া গেছে। আজও জাপানের আদিম বাসিন্দা আইনু এবং অন্যান্য জাতিদেরও মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

আদিম মানুষদের প্রধান শত্রু ছিল ওই গুহাভালুকরা! তাদের বলবিক্রমের উপরে মানুষদের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, খুব সম্ভব সেইজন্যেই অন্যান্য বাজে বা দুর্বল পশুর বদলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভালুক বলি দিয়ে প্রার্থনা করা হত, যারা বলি দিচ্ছে তারা যেন ভালুকেরই মতো মহাবলী হতে পারে।

আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে কারুকে বীর ও যথার্থ পুরুষ বলে গণ্য করা হয় না, যদি এক একটি সিংহ বধ করতে না পারে। রাজপুতদের পুরুষত্বের বিচার হয় বন্য বরাহ শিকারে। আদিমকালে যে গুহাভালুক বধ করতে পারত তাকে মানা হত মহাবীর বলে। সে যুগে ভালুকদের কেবল বলিই দেওয়া হত না। বলির পর ভালুকদের মাথার হাড় আগে খুব যত্ন করে সাজিয়ে তুলে রেখে দেওয়া হত সারে সারে। খুব সম্ভব সেগুলোকে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস বলে ভাবা হত। অনেক হাজার বছর পরে সেই হাড়গুলোকে ঠিক তেমনিভাবে সাজানো অবস্থাতেই আবার পাওয়া গিয়েছে।

ভালুককে সবাই মিলে সভাস্থলের মাঝখানে এনে হাজির করলে, অমনি সভার সমস্ত লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল—সূর্য-সর্দার পর্যন্ত।

সূর্য সর্দার হচ্ছেন দলের প্রধান ব্যক্তি, অতএব বলির কার্যারম্ভের ভার তারই উপরে। তিনি বাঁ হাতে ধনুক ও ডান হাতে বাণ নিয়ে ভালুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, আলোকস্রষ্টা হে সূর্যদেবতা! তৃষ্ণার বারিদাতা হে নদীদেবতা! নিঃশ্বাসবায়ুদাতা হে পবনদেবতা! অন্ধকারে চক্ষুদাতা হে অগ্নিদেবতা! তোমাদের সকলের কাছে এই বলির পশু নিবেদন করছি, তোমরা আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমাদিগকে এই ভালুকের মতো শক্তিমান করে

তোলো!—তার প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো দামামা সমস্বরে বেজে উঠল তালে তালে এবং তারপরেই সূর্য-সর্দার ধনুক থেকে বাণ ত্যাগ করলেন!

বাণ গিয়ে বিঁধল ভালুকের বুকের কাছে এবং পরমুহূর্তেই সভাস্থ সমস্ত শিকারি যোদ্ধা একসঙ্গে জয়ধ্বনি তুলে ভালুককে লক্ষ্য করে বর্শা বা বাণ ছুঁড়তে লাগল!

সর্দারের বাণ খেয়ে ভালুকটা একবার মাত্র গর্জন করবার সময় পেয়েছিল, তারপরেই একসঙ্গে অতগুলো অস্ত্রের আঘাতে তার মৃতদেহ মাটির উপরে ধড়াস করে পড়ে গেল, আর নড়ল না! তারপরে চারিদিকের উত্তেজনা, দামামা-নিনাদ, জয়ধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যে সূর্য-সর্দার আবার পাথরের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করতে লাগলেন বারংবার। ওদিকে জনতার সমস্ত লোক এগিয়ে এসে ভালুকের চারিধারে চক্রাকারে বেড়ে দাঁড়াল এবং দামামার তালে তালে বিজয় বা যুদ্ধ নৃত্য আরম্ভ করলে। কলকাতায় আধুনিক ছেলে মেয়েদের যে তরল ও চুটকি নাচ দেখা যায়, এ নাচ নয় তেমনধারা! এর প্রতি ছন্দে বীর্যের ব্যঞ্জনা, প্রতি পদক্ষেপে প্রলয়ের তাল, প্রতি ভঙ্গিতে আদিম দরাজ প্রাণের উচ্ছ্বাস! একালের কোনও নিজিনিস্কি বা উদয়শঙ্করই সেই বন্য, স্বাধীন নৃত্যের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেখাতে পারবে না।

নর্তকরা যখন শ্রান্ত হয়ে থামল, দামামা যখন মৌন হল, সূর্য-সর্দার বললেন, বন্ধুগণ, দেবতারা নিশ্চয়ই বলি পেয়ে আর তোমাদের নাচ দেখে তুষ্ট হয়েছেন। এইবার চলো, আমরা সকলে মিলে বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকি। আজ চাই গোটাকয় বল্গা-হরিণ আর বরাহ। তারপর ফিরে এসে বিরাট ভোজের আয়োজন হবে!

সর্দারের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই আচম্বিতে কোথা থেকে তীব্র স্বরে শিঙা বললে তিনবার—ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ!

সূর্য সর্দার সচমকে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন, এ যে আমাদের প্রহরীর সঙ্কেত শত্রুরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে!

চারিধারে অমনি রব উঠল—শত্রু! শত্রু! অস্ত্র ধরো! অস্ত্র ধরো! মেয়েরা তাবুর ভেতরে যাক!

দেখতে দেখতে ভিড়ের ভিতরে যত মেয়ে ছিল সবাই তাবুর দিকে দৌড় দিলে এবং যোদ্ধারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করতে লাগল ব্যস্তভাবে।

শিঙা আবার চেঁচিয়ে উঠল, ভোঁ! ভোঁ! ভোঁ! ভোঁ!

অগ্নি বললে, 'বাবা, প্রহরী এবারে শিঙায় চারটে ফুঁ দিলে। তার মানে শত্রুদের সংখ্যা হচ্ছে চার শত!

সূর্য-সর্দার জবাব দিলেন না, শত্রুদের আবিষ্কার করবার জন্যে তীক্ষ্ণ নেত্রে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছেলেকে সান্তনা দেবার জন্যে সূর্য-সর্দার চোখ না ফিরিয়েই বললেন, বাছা, শত্রুদের সংখ্যা বেশি হলেই হতাশ হবার কারণ নেই। আগে দেখা যাক, শত্রুরা কোন জাতের মানুষ! প্রহরী সঙ্কেতে সে কথা জানাচ্ছে না কেন?

কয়েক মুহুর্ত পরেই শিঙা টানা সুরে বললে, ভোঁ-ও-ও-ও-ও।

সূর্য-সর্দার তখন সহস্যে উচ্চস্বরে বললেন, বন্ধুগণ, সঙ্কেতে জানা গেল, রাক্ষসরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! আমরাও তো তাই চাই! ওরা না এলে আমরাই ওদের আক্রমণ করতে যেতুম, কিন্তু ওরা নিজেরাই এসে আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলে! দলে ওরা ভারী বলে আমাদের ভাবনার কারণ নেই। কারণ আমরা সকলেই জানি, রাক্ষসরা তির-ধনুক ব্যবহার করতে জানে না! অতএব দাঁড়াও সবাই সারি সারি, বাজাও দামামায় যুদ্ধসংগীত! উঠল বেজে দামামার পর দামামা, শিঙার পর শিঙা! যোদ্ধারা শ্রেণীবদ্ধ হতে লাগল। তারপরেই দেখা গেল, শত্রুরা দলে দলে বিশৃঙ্খলভাবে লাফাতে লাফাতে, নাচতে নাচতে পাহাড়ের তলদেশের সুদীর্ঘ অরণ্যের নানা দিক থেকে বেরিয়ে এল! অতর্কিতে

আক্রমণ করবে বলে এতক্ষণ তারা চ্যাঁচায়নি, এইবারে শুরু করলে বিকট চিৎকারের পর চিৎকার! সূর্য-সর্দার অল্পক্ষণ তাদের ভাবভঙ্গি ও অস্ত্রশস্ত্র লক্ষ্য করে বললেন, ওরা মূর্খ। দেখছি ওরা ঠাউরেছে যে, জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে! যেন আমরা বন্য জন্তু, কাঠের আগুন দেখলে ভয় পাব!

অগ্নি বললে, বাবা, ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমাদের কর্তব্য কী? আমরা কি আগেই ওঁদের আক্রমণ করব?

সূর্য-সর্দার বললেন, না। দেখছ না, আমরা উচ্চভূমির উপরে আছি? এখান থেকে নামলে আমাদের সুবিধা কমে যাবে! বিশেষ, আমরা যদি ওদের কাছে গিয়ে পড়ি তাহলে বাণ ছোড়বারও সুবিধা হবে না। হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদেরই হারতে হবে। কারণ একে ওরা সংখ্যায় বেশি, তার উপরে গায়ের জোরেও আমরা ওদের কাছে দাঁড়াতে পারব না।

অগ্নি বললে, তবে কি আমরা এইখানেই দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করব?

—হ্যাঁ। সবাই এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে থেকে না। তাবুগুলো পিছনে রেখে, অর্ধচন্দ্রাকারে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাড়াও। যতক্ষণ না ওরা আমাদের বাণের সীমানার মধ্যে আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করো?

শিঙা নিয়ে সঙ্কেত-ধ্বনি করে অগ্নি পিতার আদেশ প্রচার করে দিলে। তিনশত যোদ্ধা তৎক্ষণাৎ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করে ফেললে। যোদ্ধাদের পিছনে রইল তাবুর ভিতরে মেয়েরা— শত্রুদের নাগালের বাইরে। অর্ধচন্দ্রের মাঝখানে দুই পাশে দুই ছেলেকে নিয়ে এসে দাঁড়লেন সূর্য-সর্দার স্বয়ং।

ওদিক থেকে হই-চই তুলে, মুখ ভেংচে ও লাফালাফি করে যারা আক্রমণ করতে আসছে, তাদের মধ্যে ব্যূহ, শ্রেণী, শৃঙ্খলা কোনওরকম পদ্ধতিরই বালাই ছিল না। তাদের নির্ভরতা কেবল নিজেদের পশুশক্তির উপরে। আর আছে তাদের খোকা-আগুন –খাঁড়াদেঁতো ও গুহাভালুক যার সামনে দাঁড়াতে পারে না, তার

সামনে মানুষপোকাগুলো তো তুচ্ছ! সেই হল তাদের যুক্তি। কেবল হুঁহুঁ কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছে না। সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চোখে নতুন মানুষদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে করতে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে।

হাঁহাঁ বিরক্ত স্বরে বললে, হ্যাঁ রে হুঁহুঁ, তুই আবার পিছিয়ে পড়লি যে রে! দেরি করলে খোকা-আগুন তোর হাত থেকে পালিয়ে যাবে, জনিস না?

হুঁহুঁ বিস্ফারিত নেত্রে একদিকে তাকিয়ে বললে, দেখ রে সর্দার, দেখ!

—কী? কোনও কোনও তাবুর ভিতর থেকে ফাক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল—বোধহয় উনুনের জ্বালানি কাঠের ধোঁয়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হুঁহুঁ বললে, দেখ, ওদেরও কাছে খোকা-আগুন আছে রে!

হাঁহাঁ দেখে প্রথমে দস্তুরমতো ভড়কে গেল। কিন্তু তারপরেই সে ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বললে, ও বাজে খোকা-আগুন রে! ওদের যদি আগুন-মন্তর জানা থাকত, তাহলে ওরা হাতে কতগুলো কাঠি নিয়ে নাড়ানাড়ি করত না!

—হয়তো ওইগুলোই ওদের নতুন ফুসমন্তর।

—ফুসমন্তর ফুসমন্তর করেই কবে তুই ফুস করে পটল তুলবি রে!...... এগিয়ে চল। ওরা আমাদের খোকা-আগুনকে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এগুতে চাইছে না।

টুটু বললে, দাঁড়িয়ে থাকলেই প্রাণ বাঁচবে কিনা! আমরা আর একটু কাছে গেলেই মজাটা টের পাবে!

ঘটু বললে, যেমন টের পেয়েছিল ভালুক আর খাঁড়াদেঁতো—

হুঁহুঁর দিকে আড়-চোখে চেয়ে হা-হা করে হেসে হাঁহাঁ বললে, আর টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ!

টুটু বললে, হ্যাঁ।

সেকথা যেন শুনতেই পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে হুঁহুঁ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালে।

প্রস্তরযুগ হলেও বাপের এমন অপমান ঢুঁঢুঁরও ভালো লাগবে না। সে-ও মুখ ফেরালে অন্যদিকে।

হাঁহাঁ দামামা-ধ্বনি শুনতে শুনতে বললে, অমন দুম-দাম শব্দ করে কানের পোকা বার করছে কারা বল দিকি?

হুঁহু ফুসমন্তর সম্বন্ধে আবার কী মত প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঢুঁঢুঁ রাগ-ভরা চোখে বাপের দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলে!

টুটু বললে, বোধহয় যে জানোয়ারগুলোর পিঠে চড়ে ওরা নদীতে বেড়ায়, তারাই খিদের চোটে চেঁচিয়ে মরছে!

—তাই হবে।

ঘটু বললে, লড়ায়ে জিতে ফেরবার সময়ে জানোয়ারগুলোকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

হাঁহাঁ মাথা নেড়ে বললে, না, না! বড্ড চ্যাঁচায়। ঘুমোতে দেবে না।

এমনি সব আজে-বাজে কথা কইতে কইতে তারা যে অজানা মৃত্যুর সীমানার মধ্যে এসে পড়েছে, সেটা আন্দাজও করতে পারলে না! নতুন মানুষরা অকস্মাৎ ধনুকের ছিলা টেনে বাণ ছাড়লে। এবং পরমুহূর্তে যা ঘটল, সেটা সম্পূর্ণরূপে তাদের ধারণাতীত! ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ উড়ে এসে হাঁহাঁদের দলের ভিতরে গোঁত খেয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পনেরো-ষোলো জন লোক নিহত বা আহত হয়ে পপাত ধরণীতলে! পরমুহূর্তে তেড়ে এল আবার অসংখ্য মৃত্যুদূত এবং আবার কয়েকটা মূর্তি করলে পৃথিবীকে আলিঙ্গন!

তারপর নতুন মানুষরা বাণ ছোড়া থামিয়ে ধনুক নামিয়ে ফলাফল দেখতে লাগল। অসভ্যদের লাফালাফি ও জয়ধ্বনি থেমে গেল একেবারে, তার বদলে জেগে উঠল আকাশভেদী আর্তনাদ!

হাঁহাঁ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না, হতভম্বের মতো রক্তাক্ত মূর্তিগুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ! তারপর বিস্মিত স্বরে ঠিক গুহাভালুকের মতোই বললে, অ্যাঃ! কাঠি ছুড়ে কাবু করলে!

হুঁহুঁ ত্রস্তভাবে পিছোতে পিছোতে বললে, বাপ রে বাপ, কী ফুসমন্তর।

এমন সময়ে এল আবার এক ঝাঁক বাণ! এবারে প্রথমেই বাণ খেয়ে বাপের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘটু। বাণ বিধেছে তার বুকে!

মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে ঘটু ডাকলে, বাবা!

হাঁহাঁ মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, ঘটু রে!

দুইহাতে নিজের বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটু বললে, আমাকে যে মেরেছে তাকে তুই মারিস রে বাপ! তাকে তুই খুঁজে বার করিস, তাকে তুই ছাড়িসনে, তাকে তুই—' আর কিছু বলবার আগেই তার মৃত্যু হল।

ছেলের দেহ কোলের উপর টেনে নিয়ে হাঁহাঁ অশ্রু-অস্পষ্ট চোখে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে, উচ্চভূমির উপরে নতুন মানুষরা ঠিক পাথরের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনও হত বা আহত হয়নি! হাঁহাঁর অনুচররা তাদের লক্ষ্য করে কতগুলো জুলন্ত কাঠ ছুঁড়েছে বটে, কিন্তু একগাছা কাঠও তাদের কাছ পর্যন্ত পৌছোয়নি।

কিন্তু প্রার্থীদের দলে মরেছে বা জখম হয়েছে প্রায় চল্লিশজন লোক। দলের অনেকেরই যুদ্ধ করবার শখ এখন মিটে গেছে, তারা পায়ে পায়ে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে এবং যারা এখনও পালায়নি তারাও পালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, কিংবা অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। তাদের অনেকের হাতেই আর জ্বলন্ত কাঠ নেই, যাদের হাতে আছে তাদের কাঠে আগুন নেই।

হাঁহাঁ হঠাৎ প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকানি দিলে, তার তৈলহীন জটার মতন লম্বা রুক্ষ চুলগুলো ঠিক যেন একদল ক্রুদ্ধ সপের মতো চতুর্দিকে ঠিকরে পড়ল লটপট করে! তারপরেই ছেলের মৃতদেহ মাটিতে নামিয়ে রেখে তড়াক করে লাফ

মেরে সে দাঁড়িয়ে উঠল এবং পিঠে বাঁধা বর্শা ও কোমরে ঝোলানো মুগুর এক এক টানে খুলে নিয়ে দুই হাতে ধরে বজ্রকঠিন স্বরে হেঁকে বললে, কী রে ভিতুর পাল, তোরা পালাবি নাকি রে? চেয়ে দেখ মাটির দিকে, তোদের বন্ধুদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে! পোকার মতন দেখতে ওই বিদেশিগুলো এসে তাদের বধ করলে, আর প্রতিশোধ না নিয়ে তোরা পালাবি নাকি রে?

একজন বললে, আমাদের খোকা-আগুন পালিয়ে গেছে রে সর্দার?

দপ দপ করে হাঁহাঁর দুই ভীষণ চক্ষু জ্বলে উঠল! বিপুল ক্রোধে তার বিষম চওড়া বক্ষ ফুলে আরও চওড়া হয়েছে এবং বিকট দন্তগুলো কালো মুখের ভিতর থেকে দেখাচ্ছে যেন বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো চকচকে। সত্যিই এখন তার দানব মূর্তি। কর্কশ কণ্ঠে সে আবার চিৎকার করে বললে, তোদের মতো ভিতুর হাতে খোকা-আগুন থাকবে কেন? এতক্ষণে তোরা একটা শত্রু মারতে পারলি না, তাই তো আগুন তোদের ত্যাগ করেছে! আগুন গেছে, তোদের কাছে বর্শা নেই কুঠার নেই মুগুর নেই? এতদিন তোরা কী নিয়ে লড়াই করে এসেছিস রে?

যুদ্ধপাগল আদিম মানুষ, হাঁহাঁর দৃপ্ত উৎসাহবাণীতে জেগে উঠল আবার তাদের রণোন্মাদনা!—নেচে উঠল ধমণীর তপ্ত পশুরক্ত! তারা রুখে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ রে হাঁহাঁসর্দার! আমরা ভিতু নই—আমরা হয় মারব, নয় মরব! হারে রে রে রে রে!

হাঁহাঁ এক হাতে বর্শা ও আর এক হাতে মুগুর উঁচিয়ে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো তীরবেগে ছুটতে ছুটতে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! হয় মারব, নয় মরব! কে আসবি আমার সঙ্গে, ছুটে আয় রে মরদ-বাচ্ছা, ছুটে আয়!

তার সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে চলল ভয়াবহ হুঙ্কার তুলে প্রায় দুইশত আদিম যোদ্ধা। হুঁহুঁ গেল না। ঢুঁঢুঁও গেল না। হুঁহুঁ বললে, ওরা মরণের মুখে ছুটেছে। আমরাও কেন ওদের সঙ্গে মরব রে?

ঢুঁঢুঁ বললে, ঠিক বলেছিস রে বাপ! চল ফিরে যাই!

উচ্চভূমি থেকে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ ছুটে আসছে! আবার অনেকে মরল, আবার অনেকে পালাল। কিন্তু জন-পঞ্চাশের গতিরোধ করতে পারলে না কেউ!

পদে পদে লোক মরছে, তবু তারা থামল না। হাতে কাঁধে উরুতে বাণ বিঁধছে, তবু তারা থামল না। তিনশো শত্রু চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলবার জন্যে ছুটে আসছে, তবু তারা থামল না। তারা মরিয়া! তারা প্রাণের মায়া রাখে না। তাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে কেবল মৃত্যু।

হাঁহাঁ ভয়ানক স্বরে অট্টহাস্য করে বললে, চলে আয় রে মরদবাচ্ছা, চলে আয়! ওই ওদের সর্দার—আমি মারব ওকে, তোরা যে যাকে পারিস মার। হয় মার, নয় মর!

হাঁহাঁরা তখন নতুন মানুষদের দলের ভিতরে ঢুকে পড়েছে মত্ত হস্তীদলের মতো। তারা যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই দলে দলে শত্রু। এত কাছে ধনুক-বাণ অচল দেখে শত্রুরাও ধরলে বর্শা বা কুঠার বা মুগুর। আরম্ভ হল তখন বিষম হাতাহাতি লড়াই। হাঁহাঁর চোখের সামনে বর্শা আঘাতে টুটু ভূতলশায়ী হল, তবু তার ভ্রূক্ষেপও নেই। তার নিজের বর্শা ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল, হাঁহাঁ খেয়ালেও আনলে না। দুই হাতে মুগুর ধরে ডাইনে বামে সমানে আঘাত করতে করতে সূর্য-সর্দারের দিকে অটল পদে এগিয়ে চলল, সে শরীরী বজ্রকে ঠেকায় কার সাধ্য! তার সুমুখে দাঁড়ায় কার সাধ্য! অবশেষে হাঁহাঁ তার লক্ষ্যস্থলে এসে হাজির হয়ে হো হো রবে হেসে উঠে উন্মত্তের মতন বলে উঠল, এইবারে তোকে পেয়েছি রে পালের গোদা! বলেই দুই হাতে মুগুর তুলে প্রাণপণে আঘাত করলে সূর্য-সর্দারকে!

সূর্য-সর্দারও নিজের মুগুর তুলে হাঁহাঁর মুগুরকে ঠেকাতে গেলেন, কিন্তু হাঁহাঁ বুঝেছিল তখন তার অন্তিমকাল উপস্থিত, তাই সে তার মহা-বলিষ্ঠ বিরাট দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে এই চরম আঘাত করেছিল, কাজেই সূর্য-সর্দারের

মুগুর হাঁহাঁর মুগুরকে ঠেকিয়েও তাকে থামাতে পারলে না, দুই যোদ্ধার দেহই একসঙ্গে জড়াজড়ি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। তখন চারিদিক থেকে অনেক লোক ছুটে এসে হাঁহাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কেউ মারলে কুঠারের ঘা—কেউ দিলে বর্শার খোঁচা! কিন্তু তার আর দরকার ছিল না, কারণ এই চরম আঘাত করবার জন্যেই সে ছিল এতক্ষণ বেঁচে। মুগুরের দ্বারা শত্রুকে শেষ আঘাত করেই সে শক্তিহারা হয়ে মৃত্যুর মুখে করেছে আত্মদান!.......

সূর্য-সর্দার কেবল মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। জ্ঞান হবার পর রক্তাক্ত দেহে উঠে বসে দেখলেন, শত্রুদের কেউ আর বেঁচে নেই! কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ জন শত্রুর শেষ আক্রমণে তাঁর দলে হত বা আহত হয়েছে একশো কুড়ি জন!

অভিভূত স্বরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাক্ষসরা যথার্থ যোদ্ধা বটে। কিন্তু এদের সম্বল শুধু পশুশক্তি। ওর সঙ্গে ওদের মনের শক্তি থাকলে পৃথিবীতে আমরা কেউ বেঁচে থাকতুম না!

সূর্য-সর্দার যাকে মনের শক্তি বললেন, এখনকার পণ্ডিতরা তাকে বলেন মস্তিষ্কের শক্তি। কেবল উত্তর ভারতের নানা স্থানে নয়, গোটা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সে-যুগের আদিম মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধেছিল নতুন মানুষদের। কিন্তু শুধু দেহের শক্তির উপরে নির্ভর করেছিল বলে আদিম মানুষরা কোথাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি।

প্রথম মনুষ্য সৃষ্টির পর দশ লক্ষ বৎসর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘকালব্যাপী মস্তিষ্ক-চর্চার ফল হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মস্তিষ্কের মহিমায় মানুষ যে উন্নতির পথে আরও কতখানি অগ্রসর হবে, সে কথা জানে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ।

পরিশিষ্ট

গল্প তো ফুরাল, কিন্তু আমার শেষ কথা এখনও বাকি। বোধ হচ্ছে, কোনও কোনও বিষয় নিয়ে কারুর মনে প্রশ্ন উঠতে পারে। আন্দাজে দু-একটা উত্তর দিয়ে রাখি।

'মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার' উপন্যাসের আকারে লেখা হল আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তরঞ্জনের জন্যে। কিন্তু কেবল উপন্যাসরূপে পাঠ করলে এ রচনাটির আসল উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ। কারণ গল্পের ভিতর দিয়ে আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষ ও তার জীবনযাত্রাপদ্ধতির যে ছবি ফোটাবার চেষ্টা করেছি, তা কাল্পনিক হলেও কল্পনার মূলে আছে প্রধানত বিশেষজ্ঞদের মতামত।

আদিম মানুষদের নিয়ে পণ্ডিতদের অনুসন্ধান-কার্য এখনও সমাপ্ত হয়নি— অদূর ভবিষ্যতেও সমাপ্ত হবাল সম্ভাবনা নেই। যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত হতে বাকি তার চেয়ে ঢের বেশি! সমস্তটা কখনও আবিস্কৃত হবে কি না সন্দেহ! মহাকাল অনেক প্রমাণ নিঃশেষে ধ্বংস করেছেন— আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মুখ তাকাননি।

যতটা জানা গিয়েছে, তার দ্বারাও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার উপায় নেই। কারণ বিশেষজ্ঞদেরও মধ্যে মতভেদ দেখা যায় সর্বত্র। Sir Arthur Keith, Dr. Davidson Black, H. J. Fleure, Dr. E. Dubois, Professor H. F. Osborn, R. R. Marret, Sir G. E. Smith ও Darwin প্রভৃতির মতামত পাঠ করেও নির্দিষ্ট কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। Keith সাহেবের মতন বিশেষজ্ঞও স্পষ্ট ভাষায় বলতে বাধ্য হয়েছেন, আমাদের অনুসন্ধান সবে আরম্ভ হয়েছে। এমন অনেক কিছুই আছে যা আমরা এখনও বুঝতে পারি না। এক্ষেত্রে আমাদের মতন সাধারণ লোকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

মানুষ যে গোড়ায় কী ছিল, এখনও সেইটেই জানা যায়নি। Darwin ও Lamark সাহেব বলেন, মানুষের উৎপত্তি শিম্পাঞ্জির মতো কোনও লাঙ্গুলহীন বানর থেকে। Keith সাহেবেরও ওই মত।

আবার Professor H. F. Osborn-এর মত হচ্ছে, আমি মানুষের ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করি, কিন্তু লাঙ্গুলহীন বানর থেকে যে তার উৎপত্তি, এ কথায় বিশ্বাস করি না। মানুষ তার নিজের পথ ধরেই বরাবর এগিয়ে এসেছে, কখনও তাকে বানর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি। আবার Professur Westenhofer সম্পূর্ণ উলটো কথা বলেন। তার মতে, মানুষ থেকেই লাঙ্গুলহীন বানরের উৎপত্তি। এই অদ্ভুত মতানৈক্যের জঙ্গলে আমাদের মতন সাধারণ পাঠককে পথ হারাতে হয় পদে পদে। আমরা কোন দিকে যাবে? কার কথায় বিশ্বাস করব? কোন দেশে মানুষের প্রথম আবির্ভাব, তা নিয়েও তর্কাতর্কির অন্ত নেই। Darwin, Smith ও Broom প্রভৃতি পণ্ডিতরা বলেন, মানুষের প্রথম জন্মভূমি হচ্ছে আফ্রিকা। তাদের মতে, আফ্রিকায় যখন গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মতো লাঙ্গুলহীন বানরের জন্ম হয়েছে তখন ওইখানেই মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে ওই মতই যথেষ্ট নয়। ভারতের কাছেই জাভা দ্বীপে মানুষের সবচেয়ে পুরানো কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এবং তার পাশাপাশি দ্বীপে—সুমাত্রায় ও বোনিয়োয়— যখন লাঙ্গুলহীন বানর জাতীয় বৃহৎ ওরাংউটানের বাস, তখন পূর্ব-মত অনুসারে ওই অঞ্চলেও মানুষের প্রথম জন্ম হতে পারে।

আধুনিক বহু পণ্ডিত বলেন, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলেই মানুষ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। হিমালয়ের পাদপ্রদেশে (অর্থাৎ শিবলিক শৈলশ্রেণীর মধ্যে) সম্প্রতি নানা জাতের লাঙ্গুলহীন বানরের শিলীভূত কঙ্কাল (fossil) আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের Dryopithecus নামে ডাকা হয়। আদিম বানরদের মধ্যে তারা

ছিল অতিকায়। নিউ ইয়র্কের W. K. Gregory সাহেবের মতে, দাঁতের গড়নে তারা ছিল বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষদের মতো। চিনদেশেও যে আদিম মানুষের (Peking man নামে বিখ্যাত) কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, প্রাচীনতায় তা স্থান পেয়েছে জাভার মানুষের পরেই। এইসব কারণে আধুনিক অনেক বিশেষজ্ঞ প্রাচ্য দেশকেই প্রথম মানুষের জন্মক্ষেত্র বলে বিশ্বাস করেন।

পণ্ডিতদের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ও মস্তিষ্কচালনার ফলে জানাও গিয়েছে অনেক কিছু। প্রাগৈতিহাসিক রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অংশবিশেষ তুলে তারা নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন যেসব বিষয় সম্বন্ধে তারা প্রায় নিঃসন্দেহ, বর্তমান ক্ষেত্রে সেইগুলিই হয়েছে আমার প্রধান অবলম্বন। আমরা এই গল্পে যে নিয়ানডের্টাল মানুষদের কথা বলেছি, তারা ছিল কতকটা বানরধর্মী মানুষের শেষ বংশধর। (তারা অগ্নি, বস্ত্র ও অস্ত্র ব্যবহার করত এবং কথা কইত বলে ধরা যায়, যথার্থ মানুষি চিন্তাশক্তি তাদের ছিল। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বোধহয় তাদের অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ মৃতদেহকে তারা সযত্নে গোর দিত।) ১৮৫৭ শতকে জার্মানির ডুসেলডর্ফ নামক স্থানে নিয়ানডের্টাল গুহায় সর্বপ্রথমে তাদের কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তাই ওই নাম। মাথায় তারা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশি উঁচু হত না, কারুর কারুর মতে আফ্রিকার আধুনিক অসভ্য মানুষ হটেনটটদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। কেবল ইউরোপের নানা স্থানে নয়, আফ্রিকায় এবং এশিয়াতেও (ককেসসে ও প্যালেস্টাইনেও) তাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। ভারতে এখনও তাদের কঙ্কাল পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি, আদিমকালে এখানেও তারা কিংবা তাদের কোনও নিকট আত্মীয় বা প্রায় ওই-জাতীয় মানুষ বিচরণ করত। কিন্তু তর্কের খাতিরে কেউ যদি জোর করে বলেন যে, নিয়ানডেটালীদের কঙ্কাল যখন ভারতে পাওয়া যায়নি, তখন এদেশে তাদের আবির্ভাব দেখানো মস্ত ভুল, তাহলে আমি প্রতিবাদ করব না। তবে এক্ষেত্রে আর একটি কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জাভাদ্বীপেও নিয়ানডেটার্ল' লক্ষণ-বিশিষ্ট মানুষের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তার নাম রাখা হয়েছে 'সোলো'-মানুষ।

বহু পণ্ডিতের মতে, ক্রো-ম্যাগনন জাতের মানুষও এশিয়া থেকে ইউরোপে প্রবেশ করে। সুতরাং ভারতেও তারা কিংবা প্রায় ওই-জাতের মানুষদের আবির্ভাব স্বাভাবিক। নিয়ানডের্টালরা সিধে হয়ে হাঁটতে পারত না, এরা পারত। এবং এদের মধ্যে বানরকে মনে পড়ে, এমন কোনও লক্ষণই ছিল না। কিন্তু ইউরোপ থেকে এদের জাতও আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে, (Fleure-এর মতে) আধুনিক বহু মানুষের উপরে নিজেদের অল্পবিস্তর ছাপ রেখে।

নিয়ানডের্টাল মানুষদের শেষ-জীবন থেকেই আমাদের গল্প আরম্ভ করেছি। তাদের প্রথম আবির্ভাবের সময়ে ক্রো ম্যাগনন মানুষরা পৃথিবীতে বর্তমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি কোনও বিশেষজ্ঞ এই কাহিনির মধ্যে ভুলভ্রান্তি পান, তাহলে তা গল্পলেখকের অজ্ঞতা বুঝে মার্জনা করবেন। আমি নৃতত্ত্ববিদ নই, নৃতত্ত্বের অল্পস্বল্প উপাদান নিয়েছি গল্পের ভিতর দিয়ে মানুষের আদিম জীবনের মোটামুটি একটি পরিচয় প্রদান করব বলে। পাঠকদের মধ্যে হয়তো আমারও চেয়ে কম অগ্রসর লোক আছেন, সেই ভরসাতেই এমন কঠিন আখ্যানবস্তু গ্রহণ করেছি। পণ্ডিতদের জন্যে নয়, তাদের জন্যেই এই কাহিনি। তাদের ভালো লাগলেই আমরা শ্রম সার্থক।

—ইতি